POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর,নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞানী।

(আল আরাফ: ২০১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 30

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 25 July, 2024 18 মহররম 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

নামায মানুষের রক্ষা কবচ। (এতে) পাঁচ ওয়াক্ত দোয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। কোন দোয়া তো শোনা হবে। এই জন্য নামাযকে অতি যত্নসহকারে পড়া উচিত এবং আমার কাছে এটিই সব থেকে প্রিয় বিষয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

'রহমানিয়াত' এর পরিপূর্ণ বিকাশস্থল হলেন মহম্মদ (সা.)কেননা, মহম্মদ-এর অর্থ প্রশংসিত এবং রহমান এর অর্থ হল অযাচিতভাবে মোমেন কাফের নির্বিশেষে সকলের জন্য দাতা। আর একথা স্পষ্ট যে, যে-সত্তা অযাচিতভাবে দান করবে, অবশ্যই তার প্রশংসা হবে। অতএব, মহম্মদ (সা.)এর সত্তায় রহমানীয়্যত'এর জ্যোতির্বিকাশ ঘটেছিল আর 'আহমদ' নামের মধ্যে রহীমিয়্যত এর প্রকাশ ঘটেছিল। কেননা রহীম এর অর্থ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার প্রতিদান দাতা আর আহমদ এর অর্থ প্রশংসাকারী। আর এটাও সাধারণ বিষয় যে, যে-যখন কোন ব্যক্তি কারোর ভাল কাজ করে, তখন তার প্রতি সন্তুষ্ট হয় এবং তার পরিশ্রমের প্রতিদান দেয় এবং তার প্রশংসা করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদ নামের মাঝে রহীমিয়্যত' এর বিকাশ ঘটেছে। অতএব, আল্লাহ্‌ মহম্মদ (রহমান) এবং আহমদ (রহীম)। অর্থাৎ রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) আল্লাহ্‌ তা'লার এই দুই মহান গুণ-'রহমানীয়্যত ও রহীমিয়্যত' এর বিকাশস্থল ছিলেন।"

* পৃথিবী এক রেলগাড়ি তুল্য আর আমাদের সকলকে বয়সের টিকিট দেওয়া হয়েছে। যার যেখানে গন্তব্য,তাকে সেখানে নামিয়ে দেওয়া হয়।অর্থাৎ সে মারা যায়। তবে মানুষ কোন জীবন নিয়ে এমন কল্প-বিলাস হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ আশার স্বপ্ন বোনে?

* নামায মানুষের রক্ষা কবচ। (এতে) পাঁচ ওয়াক্ত দোয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। কোন দোয়া তো শোনা হবে। এই জন্য নামাযকে অতি যত্নসহকারে পড়া উচিত এবং আমার কাছে এটিই সব থেকে প্রিয় বিষয়।

*সূরা ফাতিহা সাতটি আয়াত এই জন্য রাখা হয়েছে যে, দোজখের সাতটি দরজা আছে। অতএব, প্রত্যেক আয়াত যেন একটি দরজা থেকে রক্ষা করে।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০)

রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর বাণী

হযরত সাআদ বিন রাবি(রা.)-এর আত্মত্যাগের স্পৃহা।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) বলেন: আমি যখন মদিনা আসি, তখন আঁ হযরত (সা.) আমার এবং সাআদ বিন রাবিয়ার মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। সাআদ বললেন-আমি আনসারদের মধ্যে বেশি ধনবান। তাই আমি আমার সম্পদের অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। আর আমার এই দুই স্ত্রীর মধ্যে যেটি আপনার পছন্দ আমি আপনার জন্য তাকে ত্যাগ করব। তার ইদ্দত পূর্ণ হলে আপনি তার সঙ্গে নিকাহ করে নিন।' বর্ণনাকারী বলেন: একথা শুনে হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ বলেন; আমার এর প্রয়োজন নেই। এখানে কি কোনও বাজার আছে যেখানে বেচাকেনা হয়? তিনি উত্তর দিলেন কায়েনকার বাজার রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন- হযরত আব্দুর রহমান একথা জানার পর সকাল সকাল সেখানে পৌঁছে যান এবং পনীর এবং ঘি নিয়ে আসেন। বর্ণনাকারী বলেন: এভাবেই তিনি প্রতিদিন সকালে বাজারে যেতেন। কিছু দিন এভাবে কাটার পর একদিন তিনি ফিরে এলেন আর তাঁর গায়ে যাফরানের দাগ ছিল। রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) বললেন: আপনি কি বিয়ে করে নিয়েছেন? তিনি বললেন: আজ্ঞে, হ্যাঁ। তিনি (সা.) প্রশ্ন করলেন; কার সঙ্গে? উত্তর দিলেন: আনসারের এক স্ত্রীর সঙ্গে। প্রশ্ন করলেন: কত মোহর দিয়েছ? নিবেদন করলেন: একটি বীজ পরিমাণ সোনা কিম্বা একটি সোনার আংটি। নবী (সা.) তাঁকে বললেন- ওলীমার আয়োজন কর, একটি ছাগল দিয়ে হলেও।

কুকুর পোষার অনুমতি

২৩২২) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল করীম (সা.) বলেছেন: যে কুকুর পোষে তার পুণ্যকর্ম থেকে প্রতিদিন এক 'কিরাত' পরিমাণ' হ্রাস পেতে থাকবে। তবে ব্যতিক্রম সেই কুকুর যা শস্যক্ষেত বা পশুদের পাহারা দেওয়ার জন্য পোষা হয়। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল হারস ওয়াল মুনযারাহ)

এই আয়াতে 'উজেয়া লিন্নাস' বাক্যাংশে সেই ভবিষ্যদ্বাণীও নিহিত ছিল যে, এই গৃহের মাধ্যমে সেই সব মানুষদের পুনর্মিলন হবে যারা এক সময় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্‌ তা'লা বায়তুল্লাহকে 'বায়তুল আতীক' নামে আখ্যায়িত করে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, হযরত ইব্রাহিম (আ.) বায়তুল্লাহ্‌ নির্মাণ করেন নি, বরং পূর্বেই এর নির্মাণ হয়েছিল। হযরত ইব্রাহিম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.)এর সঙ্গে মিলে কেবল পূর্বের ভগ্নাবশেষের উপর পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। যেমন হযরত হাজরা এবং হযরত ইসমাঈলকে ত্যাগ করে যাওয়ার সময় তিনি আল্লাহ তা'লার নিকট যে দোয়া করেন তার মধ্যে এই শব্দ আছে-

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ।

(সূরা ইব্রাহিম: ৩৮)

হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার বংশধর হইতে কতককে তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করাইয়াছি।

এর থেকে জানা যায় যে, হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর যুগের পূর্বেই বায়তুল্লাহ নির্মিত হয়েছিল। আল্লাহ্‌ তা'লা এই আয়াতে সেই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করে বলেন-

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿آل عمران:ركوع 10﴾

নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল তাহা হইল বাক্কাতে, উহা বরকতপূর্ণ এবং হেদায়াতের কারণ-সমগ্র জগতের জন্য। (আলে ইমরান: ৯৬)

এই আয়াতে 'উজেয়া লিন্নাস' বাক্যাংশে সেই ভবিষ্যদ্বাণীও নিহিত ছিল যে, এই গৃহের মাধ্যমে সেই সব মানুষদের পুনর্মিলন হবে যারা এক সময় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ এক বিশ্বজনীন ধর্মের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা তৈরী হবে। এবং এই গৃহ সমগ্র বিশ্বকে একত্রিত করার মাধ্যম হবে। যেমন মহম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সা.))এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'লা বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে একত্রিত করে দিয়েছেন আর এইরপে কাবাগৃহ ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষকে একত্রিত করার মাধ্যম হয়েছে।

যাই হোক, বায়তুল্লাহ্‌ একটা অতি প্রাচীন স্থান। ইতিহাসও এর প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দেয়। যেমন- স্যার উইলিয়াম মিউর তার রচনা 'লাইফ অব মুহাম্মদ' এ লেখেন-মক্কার ধর্মের প্রধান নীতিগুলোকে এক অতি প্রাচীন যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হয়। যদিও হেরোডেটাস এর ন্যায় প্রখ্যাত গ্রীক ভূগোলবিদ কাবার নাম উল্লেখ করেন নি, কিন্তু আরবদের প্রধান দেবতাদের মধ্য থেকে অন্যতম ইলা লাত এর কথা উল্লেখ করেছেন। (খোদাগণের খোদা) আর এটা একথার প্রমাণ যে, মক্কায় এমন এক সত্তার আরধনা করা হত যাকে প্রধান প্রধান প্রতিমাদেরও খোদা হিসেবে স্বীকার করা হত।

(তফসীর কবীর,৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মৌলিক ধর্মতত্ত্ব ও এর খুঁটিনাটি

পুরুষরা নিজেরাই ইকামত বলবে আর এমনিতেও ইকামত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রয়োজনে ইমাম নিজেও ইকামত বলতে পারে। বাড়িতে নামায হলেও মেয়েরা ইকামত বলবে না। কেননা হুযুর (সা.)-এর অনুমতি প্রদান করেন নি।

সত্যতায় কোন ধর্মের একচেটিয়া অধিকার নেই

ইসলামের বৈশিষ্ট-সূচক চেহারার বিষয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে প্রথম এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে দিকটি কাউকে বিমুগ্ধ করে,সেটা হচ্ছে এর সেই অতি-সোহাগী দাবী ত্যাগ করা যে, সত্যতা কেবল ইসলামেই বিদ্যমান এবং আর কোন সত্য ধর্ম নেই।

এ ধর্ম এ দাবীও করে না যে, কেবলমাত্র আরববাসীরাই খোদার ভালবাসার প্রাপক। ইসলামই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম, যা সেই ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে যে,কোন একক ধর্ম, জাতি অথবা সম্প্রদায়ই একমাত্র সত্য; এর বিপরীতে এটা প্রকাশে ঘোষণা দেয় যে, স্বর্গীয় নেতৃত্ব হচ্ছে এক সর্বজনীন দান, যা সব যুগেই মানবতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

পবিত্র কুরআন আমাদেরকে একথা বলে যে, 'এমন কোন জাতি অথবা সম্প্রদায় নেই, যারা স্বর্গীয় নেতৃত্বে ভূষিত হয় নি, এবং পৃথিবীর এমন কোন অঞ্চল অথবা জনগোষ্ঠী নেই, যারা খোদার নবী এবং রসুল প্রাপ্ত হয় নি।

(৩৫: ৩৫)

পৃথিবীর সব মানুষের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রকাশের বিষয়ে ইসলামের এই বিশ্বজনীন দর্শনের বিপরীতে আমরা এ ঘটনা দ্বারা মর্মাহত যে, অন্য কোন ধর্মেরই কোন কিতাবে ভিন্ন জনগোষ্ঠী অথবা জাতির মানুষের পক্ষে আল্লাহর নুর অথবা হেদায়াত প্রাপ্তির সত্যতা প্রমাণ করা অথবা ইতিহাসের কোন পর্যায়ে সে বিষয়টির সম্ভাবনার কোন কথার উল্লেখও নেই।

আসলে, কোন একটি স্থানিক অথবা আঞ্চলিক ধর্মের বৈধতার বিষয়টির উপর প্রায়শঃ অধিক মাত্রায় জোর দেওয়া হয়ে থাকে এবং অন্যান্য ধর্মের সত্যতার বিষয়টিকে এত বেশী তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়ে থাকে, যা দেখে মনে হয়, যেন বিশ্বের অন্যান্য সব অধিবাসীদের বাদ দিয়ে খোদা কেবল সেই একটি ধর্মেরই, সেই একটি জনগোষ্ঠীরই এবং সেই একটি জাতিরই রক্ষক, আর তাতে একথা বলার সুযোগ থাকে যেন সত্যের সূর্য বিশ্বের অপরাপর লোকদের বাদ দিয়ে,তাদেরকে চিরস্থায়ী অন্ধকারে নিক্ষেপ করে, কেবল এই নির্দিষ্ট দিগন্তের কতিপয় লোকের জন্যই উদিত ও অস্তমিত হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ, বাইবেল শুধু ইসরায়েলের খোদাকে পেশ করে, এবং বার বার একথাই বলে যে, 'ইসরায়েলের প্রভু খোদা মহিমান্বিত হোক' (ক্রনিসিস ১৬: ৩৬) ক্ষণিকের তরেও এটা অন্য দেশ অথবা জাতির মানুষের উপর প্রদত্ত ধর্মীয় প্রত্যাদেশের সত্যতা যাচাই করে না। এভাবে ইহুদীদের এ বিশ্বাস যে, সব ইসরায়েলী নবীকে শুধু ইসরায়েলের বিভিন্ন গোত্রের কাছেই প্রেরণ করা হয়েছিল, সেটা বাইবেলের উদ্দেশ্যও বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

যীশু একথাও ঘোষণা করেন যে,তার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল কেবল হিব্রু গোত্রগুলোর হেদায়াতের জন্য, যেভাবে তিনি বলেন,'আমাকে প্রেরণ করা হয়েছিল একমাত্র ইসরায়েলের হারানো মেষের উদ্দেশ্যে।(ইসামুয়েল, ২৫: ৩২), এবং তিনি তার শিষ্যদেরকে একথা বলে উপদেশে দিয়ে গেছেন, 'যা কিছু পবিত্র, তা কুকুরকে দিও না, এবং শুকরের সামনে মুক্তা নিক্ষেপ করো না।

(মথি, ১৫, ২১-২৫)

একইভাবে, হিন্দুধর্মও এর গ্রন্থগুলোয় কেবল মাত্র উচ্চ বংশীয় লোকদেরই সম্বোধন করে থাকে। বলা হয়েছে, 'যদি কখনও নীচু বংশের কোন লোক দৈবাৎ বেদের কোন মূল পাঠ শ্রবণ করে ফেলে, তবে রাজার উচিত হবে গলিত মোম এবং সীসা দ্বারা তার কান দু'টো সীলমোহর করে দেওয়া এবং যদি সে ধর্মগ্রন্থের কোন অংশ আবৃত্তি করে, তাহলে তার জিহ্বা কেটে ফেলতে হবে: এবং যদি সে বেদ পড়তে সফল হয়,তবে তার দেহটি ফালি ফালি করে কেটে ফেলতে হবে।

(গোতমা স্মৃতি: ১২)

এ ধরণের কঠোর আদেশগুলো যদি আমরা উপেক্ষাও করি,অথবা সেগুলোর কিছু অল্প-কঠোর ব্যাখ্যাও দান করি, তাহলেও শেষ নাগাদ এমনটিই দাঁড়ায় যে, বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থাদি, এমনকি ভাবার্থেও, অপরাপর দেশ ও মানুষের ধর্মের সত্যতার সাথে পরোক্ষভাবেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। মূল যে প্রশ্নটি এখানে উঠে আসছে, তা হচ্ছে, যদি সব গুলো ধর্মই সত্য হত,তাহলে খোদা সম্পর্কিত ধারণা এহেন সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত পরিভাষায় উপস্থাপন করার পিছনে থাকা বিজ্ঞতাটি কি? পবিত্র কুরআন সরাসরি এ সঙ্কটের সমাধান পেশ করেছে। এ গ্রন্থ বলে যে, আসলে কুরআনের প্রকাশ ও পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বেও স্বর্গীয় বার্তাবহকগণ প্রত্যেক জাতি ও বিশ্বোর প্রত্যেক অংশে প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাদের পরিধি ছিল আঞ্চলিক আর তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ছিল অস্থায়ী। এর কারণ হচ্ছে,মানব-সভ্যতা তখনো উন্নতির সে পর্যায়ে পৌঁছায়নি, যখন বিশ্বজনীন বার্তা বহন করে বিশ্বনবী প্রেরণের উপযুক্ততা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম

পবিত্র কুরআনের প্রথম পাতাটি সেই প্রভুর প্রশংসা কীর্তন করে, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক, এবং এর শেষ অংশ মানবজাতির প্রভুর কাছে প্রার্থনা করার জন্য আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। এভাবে কুরআন করীমের প্রথম ও শেষের উভয় উক্তিই কেবল আরবদের অথবা মুসলমানদের সম্পর্কেই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের ধারণাকেই উপস্থাপন করে থাকে।

নিশ্চয়ই ইসলামের পবিত্র নবীর পূর্বে কেউ সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করেন নি,এবং পবিত্র কুরআনের আগে কোন কিতাবাই সমগ্র বিশ্বকেও সম্বোধন করে নি। ইসলামের পবিত্র নবীর স্বপক্ষে এ ধরণের প্রথম দাবির ভাষা হচ্ছে,'এবং আমরা তোমাকে সমগ্র বিশ্বের সব মানুষদের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রেরণ করি নি, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। '

(৩৪:২৯)

এবং যখন কুরআন নিজেকে 'সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি বার্তা' (৮১:২৮) বলে ঘোষণা দেয়,তখন এটা নিজেকে এমন এক পথ নির্দেশক রূপে তুলে ধরে, যা সমগ্র মানবজাতির প্রকৃত উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে সংযুক্ত হয়।

কুরআনকে বার বার অন্যান্য গ্রন্থসমূহের 'সত্যতার প্রমাণকারী' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে এ উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন অন্যান্য নবীদেরকেও ঠিক সেভাবেই বিশ্বাস করে,যেভাবে তারা নিজেদের নবীকে বিশ্বাস করে। আমাদের ধর্মে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যাতে কোন দু'জন নবীর মধ্যেই কোন প্রকার পার্থক্য না করা হয়, অথবা কতিপয়কে বিশ্বাস করা এবং অন্যান্যদেরকে প্রত্যাখ্যান না করা হয়। কুরআন বলে, 'এদের প্রত্যেকেই আল্লাহকে, এবং তাঁর ফেরেশতাগণকে এবং তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রসুলদের প্রতি ঈমান রাখে (এবং বলে) 'আমরা তাঁর রসুলদের কারো মাঝে পার্থক্য করি না।' (২:৮৬)

সামগ্রিকতার বিষয়টি যদি আদতেই এক কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্য হয়,তবে এটা পর্যালোচনা করা অপ্রয়োজনীয় হবে না যে, ইসলাম কেনই বা এটার উপর এত গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলাম যখন থেকেই মানবজাতির ঐক্যের বার্তা এনেছে, তখন থেকেই প্রত্যেক এলাকায় ঐক্যের প্রতি এ ধরণের অগ্রযাত্রার পদক্ষেপ বেগবান হয়েছে। আমাদের সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাবিতক দল ও মৈত্রী-বন্ধন গঠিত হওয়া এই অগ্রগতির এক উদাহারণ। বাস্তবে, সমগ্র মানবজাতিকে একতাবদ্ধ করার দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার ভ্রান্ত-সফরে এগুলো মাইল ফলক তো বটেই। সুতরাং, আজকের উন্নত ও সভ্য মানুষ তাদের তীক্ষ্ণ অনুভূতি দ্বারা যে প্রয়োজন অনুভব করেছে,তার সমাধানের বীজ আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বেই ইসলামের বার্তায় রোপিত হওয়ার মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছিল। আজ অবশ্য ভ্রমণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন বিভিন্ন জনগোষ্ঠি ও জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য সাধনে এক নতুন অগ্রগতি সঞ্চার করেছে।

যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়, তা হচ্ছে, যা সব ধর্মই প্রকৃতপক্ষে রসুলগণ দ্বারা খোদার পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে তাদের শিক্ষার মাধ্যমে পার্থক্য কেন থাকবে? একই খোদা কি ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রেরণ করতে পারেন? এ

(এরপর ৬ ও শেষের পাতায়.....

জুমআর খুতবা

সালাম বিন মিশকাম বলল: খোদার কসম! তুমি জানো, আর তোমার সাথে আমরাও জানি যে, তিনি আল্লাহ্ তা'লার সত্য রসূল। তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে আমরা অবগত। যদি আমরা তাঁর আনুগত্য না করি তবে এর একমাত্র কারণ হলো, আমরা তাঁর প্রতি হিংসাত্মক মনোভাব রাখি, কেননা নবুয়্যত বনু হারূন থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। চলো, আমরা তাঁর প্রস্তাবিত নিরাপত্তা গ্রহণ করি।

সালাম বিন মিশকাম বলল, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই'র কথায় কোনো বিশ্বাস নেই। সে তোমাকে ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত করতে চায়। এমন কি সে চায়, তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। এক্ষেত্রে সে নিজের বাড়িতে বসে থাকবে আর তোমাকে পরিত্যাগ করবে।

আঁ হযরত (সা.) হযরত মহম্মদ বিন মুসলিমা (রা.) কে আদেশ দিলেন, বনু নযীর গোত্রের ইহুদীদের নিকট গিয়ে তাদের বল, আমাকে রসুলুল্লাহ্ (সা.) তোমাদের প্রতি এই বাতা সহ প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাও।

হুয়ী তার ভাই জুদাই বিন আখতাবকে দূত হিসেবে প্রেরণ করে বললেন, যাও মুসলমান সেনাপতিকে গিয়ে বলে দাও, আমরা এখান থেকে যাব না, তোমরা যা খুশি করতে পার। আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'হারাবাতিল ইয়াহুদ' অর্থাৎ ইহুদীরা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২১ জুন, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (২১ এহসান, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার জন্য ইহুদীদের একটি গোত্র বনু নযীরের যে চক্রান্ত ছিল, তার বর্ণনা চলছিল। গত খুতবায় আমি বলেছিলাম, এর বিস্তারিত বর্ণনা করব যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের চক্রান্ত কে বিফল করেন যা মহানবী (সা.)-কে হত্যার জন্য তারা করেছিল।

এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা.) উক্ত চক্রান্ত সম্পর্কে জানতে পারেন। আর এর বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আমর বিন জাহাশ যখন ওপরে অর্থাৎ ছাদের ওপরে চলে যায়, যেন মহানবী (সা.)-এর ওপর পাথর ফেলতে পারে, তখন মহানবী (সা.) ওহীর মাধ্যমে ইহুদীদের এই চক্রান্তে র কথা জানতে পারেন। তিনি (সা.) দ্রুত নিজ স্থান থেকে উঠেন আর তাঁর সঙ্গীদের সেখানেই বসা অবস্থায় রেখে এমনভাবে রওয়ানা হন যেন তাঁর (সা.) কোনো জরুরী কাজ আছে। আর তিনি দ্রুত মদীনায় গমন করেন। তাঁর সাহাবীরা এটিই মনে করেন যে, তিনি (সা.) কোনো প্রয়োজনে গিয়েছেন। কিন্তু যখন বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে যায় তখন সাহাবীদের তাঁর জন্য চিন্তা হয় আর তারা তাঁর সন্ধানে উঠে দাঁড়ান। পথিমধ্যে মদীনা থেকে আগত এক ব্যক্তির সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। সাহাবীরা তার কাছে মহানবী (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমি তাঁকে মদীনায় প্রবেশ করতে দেখেছিলাম। সাহাবীরা তৎক্ষণাৎ মদীনায় তাঁর (সা.) কাছে পৌঁছেন। তখন তিনি (সা.) সাহাবীদের বলেন যে, বনু নযীর কী চক্রান্ত করেছিল।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৭)

অপরদিকে ইহুদীরা তখনও নিজেদের মাঝে সলাপরামর্শ করছিল, এমন সময় একজন ইহুদী মদীনা থেকে আসে। সে যখন তার সাথীদের মহানবী (সা.) সম্পর্কে পরস্পর সলাপরামর্শ করতে শোনে তখন সে বলে, তোমরা কী করতে চাও? তারা বলে, আমরা চাই যে, আমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করব এবং তাঁর সাহাবীদের গ্রেফতার করব। সে জিজ্ঞেস করে যে, মুহাম্মদ (সা.) কোথায় আছেন? তারা বলে, এই হলেন মুহাম্মদ (সা.) যিনি কাছেই অন্য একটি স্থানে বসে আছেন। তাদের সঙ্গী তাদের বলে, আমি তো তাঁকে মদীনায় প্রবেশ করতে দেখেছি। এতে তারা বিস্মিত হয়ে যায়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৮))

অপর একজন জীবনীকার এ সম্পর্কে লিখেছেন, যখন মহানবী (সা.)-এর ফিরে আসতে কিছুটা বিলম্ব হয় তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আমাদের এখানে বসে থেকে কোনো লাভ নেই। নিশ্চয় মহানবী (সা.)-এর কাছে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ এসেছে। অতএব তারা সবাই সেখান থেকে যাত্রা করেন। তখন ইহুদীদের নেতা হুয়ী বিন আখতাব বলে যে, আবুল কাসেম ত্বরা করেছে। আমরা তো খাবারের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম। আর রক্তপণের জন্য পরামর্শ করছিলাম। আমরা তাঁকে খাবার খাইয়ে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করতে চেয়েছিলাম। অতঃপর যখন সাহাবীরা মদীনায় ফিরে আসছিলেন তখন এক ব্যক্তির সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি মহানবী (সা.)-কে দেখেছো? সে বলে, এই মাত্র তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে; তিনি (সা.) মদীনায় প্রবেশ করছিলেন। সাহাবীরা যখন সেখানে পৌঁছেন তখন মহানবী (সা.) বসে ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি সেখান থেকে চলে এলেন অথচ আমরা জানতেই পারি নি!

তিনি (সা.) বলেন, হাম্মাতিল ইয়াহুদু বিলগাদরে বী। অর্থাৎ ইহুদীরা আমার সাথে প্রতারণা করতে চেয়েছিল।

তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার ওহী অনুযায়ী দ্রুত চলে আসেন। সাহাবীদের তিনি (সা.) এজন্য কিছু জানান নি কেননা তারা বিপদের মুখে ছিলেন না। ইহুদীদের মূল লক্ষ্য কেবল তাঁর (সা.) সত্তা ছিল। তাই তিনি আশ্বস্ত ছিলেন যে, আমার সাহাবীরা কেবল সুরক্ষিত ও নিরাপদই থাকবে না, বরং তারা আমার সন্ধানে দ্রুত বের হয়ে আসবে।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪০-৪১)

বলা হয়, তখন এই আয়াতও অবতীর্ণ হয় যে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ-

(সূরা আল্ মায়েদা: ১২)

অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতকে স্মরণ করো। যখন একটি জাতি দৃঢ় সংকল্প করেছিল যে, তারা তোমাদের প্রতি নিজেদের চক্রান্তে র হাত প্রসারিত করবে। কিন্তু তিনি তাদের হাতকে তোমাদের থেকে প্র তিহত করেন। আর আল্লাহ্কে ভয় করো এবং মু'মিনদের উচিত আল্লাহ্ তা'লারই প্রতি ভরসা করা।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৯)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ সম্পর্কে লিখেছেন, তারা অর্থাৎ ইহুদীরা বাহ্যত তাঁর (সা.) আগমনে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করে আর বলে, আপনি বসুন, আমরা এখনই আমাদের অংশের অর্থ প্রদান করছি। অতএব তিনি (সা.) নিজের কয়েকজন সাহাবীসহ একটি দেয়ালের ছায়ায় বসে পড়েন। আর বনু নযীর পরস্পরসলাপরামর্শের জন্য একপাশে চলে যায় এবং এমন ভাব করে যে, আমরা অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করছি। কিন্তু অর্থে র ব্যবস্থা করার পরিবর্তে তারা এই দুরভিসন্ধি করে যে, এটি খুবই মোক্ষম সুযোগ, মুহাম্মদ (সা.) বাড়ির ছায়ায় দেয়াল ঘেঁষে বসে আছেন। কেউ অপরদিক থেকে বাড়ির ছাদে উঠুক আর এরপর একটি বড় পাথর তাঁর ওপর ফেলে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিক, নাউযুবিল্লাহ্। ইহুদীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি সালাম বিন মিশকাম এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আর বলে, এটি বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজ এবং সেই চুক্তির বিরোধী যা আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে করেছি। কিন্তু তারা তার কথা মানে নি আর অবশেষে আমর বিন জাহাশ নামের এক ইহুদী অনেক ভারী একটি পাথর নিয়ে বাড়ির ছাদে ওঠে এবং সে সেই পাথরটি ওপর থেকে প্রায় ফেলতে যাচ্ছিল। কিন্তু রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা ইহুদীদের এই অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন আর তিনি (সা.) দ্রুত

সেখান থেকে উঠে আসেন। আর তিনি এত ত্বরিত উঠেন যে, তাঁর সাহাবীরাও এবং ইহুদীরাও এটি মনে করে, হয়ত তিনি কোনো প্রয়োজনে সেখান থেকে উঠে গেছেন। অতএব তারা নিশ্চিন্তে সেখানে বসে তাঁর অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু তিনি (সা.) সেখান থেকে উঠে সোজা মদীনায় আগমন করেন। সাহাবীরা কিছুক্ষণ তাঁর জন্য অপেক্ষা করেন। কিন্তু যখন তিনি ফিরে আসেন নি তখন তারা উদ্বিগ্ন হয়ে নিজ স্থান থেকে ওঠেন আর তাঁকে (সা.) এদিক-সেদিক সন্ধান করে অবশেষে নিজেরাও মদীনায় পৌঁছে যান। এরপর মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে ইহুদীদের এই ভয়ানক চক্রান্তের সংবাদ দেন। ”

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৫২৩)

মহানবী (সা.)-এর যাবার পরের বিস্তারিত বর্ণনায় ইহুদীদের আচরণ সম্পর্কে লেখা আছে, ইহুদীরা নিজেদের কাজে অত্যন্ত লজ্জিত হয়। জনৈক ইহুদী কিনানা বিন সুয়ায়রা অথবা সুরিয়া বলে, তোমরা কি জানো মুহাম্মদ (সা.) এখান থেকে কেন উঠে গেছেন? তারা বলে, খোদার কসম! আমাদের তা জানা নেই। তোমার কিছু জানা থাকলে বলো। সে বলে, তওরাতের কসম! নিঃসন্দেহে আমি জানি যে, মুহাম্মদ (সা.)-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমরা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিলে। অতএব তোমরা এখন আর আত্মপ্রতারণায় থেকো না। খোদার কসম! নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ্‌র রসূল। আর তিনি উঠেছেনও এজন্য যে, তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তোমরা প্রতারণা করতে চেয়েছিলে। নিশ্চয় তিনি শেষ নবী। তোমরা আকাঙ্ক্ষা করছিলে, শেষ পয়গম্ব র বা নবী যেন হারূনের বংশধরদের মধ্য হতে আসেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যেখান থেকে চেয়েছেন তাঁকে আবির্ভূত করেছেন। নিঃসন্দেহে আমাদের গ্রন্থ তওরাতে যা আমরা পাঠ করি তা পরিবর্তন হয় নি। এতে লেখা আছে, এই নবী মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন। আর তিনি ইয়াসরিব তথা মদীনায় হিজরত করবেন। আমাদের গ্রন্থ তওরাতে তাঁর যে গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে তা শুধুমাত্র তাঁর {অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর} ক্ষেত্রেই সত্য প্রতিপন্ন হয়। আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা রক্তপাত ছাড়া আর কিছুই পাবে না। তোমরা ক্রন্দন ও আহাজারি করতে করতে নিজেদের ধনসম্পদ এবং সন্তানসন্ততিদের রেখে যাবে। তোমরা যদি আমার কথা মেনে নাও তাহলে তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষু ণ্ন থাকবে। আমার দুটি প্রস্তাব মেনে নাও নতুবা তৃতীয় বিষয়ে (তোমাদের জন্য) কোনো কল্যাণ নাই। তারা বলে, প্রস্তাব দুটি কী? সে বলে, প্রথম প্রস্তাবটি হলো, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথি হয়ে গেলে তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি নিরাপদ থাকবে এবং তোমরা তাঁর উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন সঙ্গীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, আর নিজেদের বাড়িঘর থেকে নির্বাসিত হবে না। কিনানা বিন সুরিয়ার প্রস্তাবের উত্তরে ইহুদীরা বলে, আমরা তওরাত এবং মূসার (সাথে কৃত) অঙ্গীকার পরিত্যাগ করব না। কিনানা বলে, (আমার) দ্বিতীয় প্রস্তাবটি হলো, তোমরা অপেক্ষা করো। অচিরেই তিনি তোমাদেরকে নির্দে শ দেবেন যে, তোমরা আমার শহর থেকে বের হয়ে যাও। এর উত্তরে তোমরা বলো, ঠিক আছে। তাহলে তিনি তোমাদের রক্ত ও ধনসম্পদকে নিজের জন্য বৈধ করবেন না (অর্থাৎ তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবেন না) বরং তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের হাতেই ছেড়ে দিবেন। চাইলে বিক্রি করতে পারো আবার চাইলে নিজেদের কাছেও রাখতে পারো। তারা বলে, ঠিক আছে, আমরা এর জন্য প্রস্তুত। সালাম বিন মিশকাম বলে, তোমরা যা বলছ তাতে আমি অপারগ হয়ে তোমাদের সাথে যোগ দিয়েছি। তিনি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) এখন আমাদের (এই মর্মে) বার্তা পাঠাতে যাচ্ছেন যে, তোমরা এই অঞ্চল থেকে বের হয়ে যাও। হে হুয়ী! (অর্থাৎ সেই নেতাকে বলেন,) তার আদেশ মানতে আবার দ্বিধান্বিত হয়ো না। সানন্দে নির্বাসিত হওয়ার (নির্দেশ) মেনে নিও এবং তার শহর থেকে চলে যেও। একথা শুনে হুয়ী বলে, আমি এমনটিই করবো এবং এখান থেকে চলে যাবো।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৯) (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪২-৪৩)

মদীনায় পৌঁছে মহানবী (সা.) এসব ষড়যন্ত্রে র বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে লেখা আছে, মহানবী (সা.) ইহুদীদের দেশান্তরের নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু তারা যেতে অস্বীকার করে। যদিও লেখা আছে যে, প্র থমে যাবে বলেছিল কিন্তু পরবর্তীতে তাদের সংকল্প পাল্টে যায়। এর আরও বিশদ বিবরণ হলো, মদীনায় পৌঁছার পর মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে ডেকে পাঠান। তিনি আসলে, মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন, তুমি বনু নযীর গোত্রের ইহুদীদের কাছে যাও এবং তাদেরকে বলবে, মহানবী (সা.) তোমাদের কাছে আমাকে এ বার্তা সহ প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা তাঁর শহর থেকে বের হয়ে যাও।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪২-৪৩)

মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বনু নযীর গোত্রের কাছে পৌঁছে বলেন, মুহাম্মদ রসূ লুল্লাহ্ (সা.) তোমাদের কাছে আমাকে একটি বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু সেটি শোনানোর পূর্বে আমি তোমাদেরকে একটি কথা স্মরণ করাচ্ছি যা তোমরা সবাই জানো। তারা জিজ্ঞেস করে, কোন কথা? মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক মূসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ তওরাতের দোহাই দিয়ে (আমি) তোমাদের জিজ্ঞেস করছি। তোমাদের (হয়ত) মনে থাকবে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি একদিন তওরাত নিয়ে তোমাদের সামনে এসে উপস্থাপন করেছিলাম। তোমরা বলেছিলে, আহার করতে চাইলে আহার করাবো, তুমি ইহুদী হতে চাইলে তোমাকে ইহুদী বানাবো। আমি বলেছিলাম, আহার করালে আমি আহার করবো। তবে ইহুদী হতে বললে সেটি সম্ভব না। এরপর তোমরা একটি থালায় খাবার দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, তুমি ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করতে চাচ্ছ না কেন? তুমি কি ইব্রাহীমের ধর্মের সন্ধান করছো? আবু আমের রাহেব কি ইব্রাহীমের ধর্মের অনুসারী নয়? সেই ধর্মের অনুসারী নবী আমাদের নিকট আসতে যাচ্ছেন, যার লক্ষণাবলী হলো, 'তিনি হাস্যবদন হবেন। সত্যের শত্রুদের নিধন করবেন। তাঁর চক্ষুদয় লালাভ হবে। তিনি ইয়েমেনের দিক থেকে আসবেন, উটের ওপর আরোহিত থাকবেন। (তাঁর) মাথায় পাগড়ি বাঁধা থাকবে। শুকনো রুটির টুকরো খেয়ে জীবন ধারণ করবেন। তাঁর গ্রীবাদেশে তরবারি ঝুলন্ত থাকবে আর তিনি প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাপূর্ণ কথা বলবেন।' ইহুদীরা বলে, তুমি সকল লক্ষণই যথার্থ বলেছ। আমরা তোমার সাথে এসব কথা বলেছিলাম, কিন্তু এসব লক্ষণ এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যে নেই। উত্তরে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে এ বিষয়টিই স্মরণ করাতে চাচ্ছিলাম। এখন মহানবী (সা.)-এর বার্তাটি শোনো। মহানবী (সা.) আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, (কারণ) তোমাদের সাথে যে চুক্তি করা হয়েছিল- তোমরা প্রতারণা করে তা ভঙ্গ করেছ। আমর বিন জাহাশ ছাদের ওপর থেকে পাথর নিক্ষেপের চক্রান্ত করেছিল, যে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর নবীকে সংবাদ দেওয়া হয়। তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ। একথা শুনে তাদের ওপর নীরবতা ছেয়ে যায়। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) মহানবী (সা.)-এর বার্তা শোনাতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, أُخْرُجُوا مِنْ بَلَدِيْ فَقَدْ أَجَّلْتُكُمْ عَشْرًا فَمَنْ رُئِيَ بَعْدَ ذَالِكَ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ অর্থাৎ, 'তোমরা আমার শহর থেকে বের হয়ে যাও, আমি তোমাদেরকে দশ দিন সময় দিচ্ছি। এরপর যদি কাউকে দেখা যায় তাহলে আমি তার শিরশ্ছেদ করব'। ইহুদীরা বলে, আমরা এটা কল্পনাও করতে পারতাম না যে, অওস গোত্রের কারও কাছ থেকে আমরা (কখনো) এমন কথা শুনব! তুমি তো আমাদের মিত্র ছিলে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, এখন মন পরিবর্তন হয়ে গেছে। অওস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকদের হৃদয়ে ইহুদীদের জন্য ভালোবাসা ছিল, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর এখন সেখানে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর ভালোবাসা বিরাজমান। মহানবী (সা.)-এর বার্তা শুনে ইহুদীরা নির্বাসনের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। বনু নযীরকে কিছু দিনের অবকাশ দেওয়া হলে তারা নির্বাসনের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। তাদের বাহনগুলো 'যী জাদার' নামক স্থানের চারণভূমিতে ছিল। মদীনা থেকে ছয় থেকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত কুবার পার্শ্ব বর্তী একটি চারণভূমি ছিল 'যী জাদার'। তারা সেগুলোকে ফেরত নিয়ে আসছিল। তারা 'আশজাআ' গোত্রের কাছে ধার হিসেবে কিছু উট দেওয়ারও অনুরোধ করে।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৭৯-১৮০] (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৮৫)

ইহুদীরা সেখান থেকে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এমন সময় মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল একটি চক্রান্ত করে। আর তার এই চক্রান্তের কারণে তাদের পরিকল্পনা পাল্টে যায়। যার বিশদ বিবরণে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে, ইহুদীরা নিজেদের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল, এর মধ্যেই আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের বার্তা আসে। সুয়ায়েদ ও দায়েস এই বার্তা নিয়ে আসে যে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বলছে, নিজেদের বাড়িঘর থেকে তোমরা বের হয়ো না, নিজেদের ধনসম্পদ পরিত্যাগ কোরো না, নিজেদের দুর্গে অবস্থান করো। আমার কাছে স্বজাতির এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের দুহাজার যুবক আছে। তারা তোমাদের সাথে তোমাদের দুর্গে প্রবেশ করবে। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি মৃত্যু বরণ না করা পর্যন্ত মুসলমানদেরকে তোমাদের কাছে পৌঁছতে দিবে না। বনু কুরায়যাও তোমাদেরকে সাহায্য করবে, তোমাদেরকে অপদস্ত করবে না। বনু গাতফান (গোত্র) থেকে তোমাদের মিত্ররাও তোমাদেরকে সাহায্য করবে, আর একান্ত ই যদি তোমরা এখান থেকে বের হতে বাধ্য হও তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে এখান থেকে চলে যাবো।

আল্লাহ্ তা'লা মুনাফিকদের এই চক্রান্ত ও প্রতারণার বিষয়টি পবিত্র কুরআনেও বর্ণনা করেছেন এবং (তা) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ نَافَقُوۡا يَقُوۡلُوۡنَ لِاِخۡوَانِهِمُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ لَئِنۡ اُخۡرِجۡتُمۡ لَنَخۡرُجَنَّ مَعَكُمۡ وَلَا نُطِيۡعُ فِيۡكُمۡ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنۡ قُوۡتِلۡتُمۡ لَنَنۡصُرَنَّكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ يَشۡهَدُ اِنَّهُمۡ لَكٰذِبُوۡنَ-(الحشر:12)

অর্থাৎ, তুমি কি মুনাফিকদের দেখো নি, যারা আহলে কিতাবের মধ্য থেকে নিজেদের সেসব কাফির ভাইকে বলে, 'যদি তোমাদেরকে (মদীনা থেকে) বের করে দেওয়া হয় তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে চলে যাবো এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কখনো কারও আনুগত্য করব না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব'।

(সূরা আল্ হাশর: ১২)

আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বনু কুরায়যার কাব বিন আসাদ কু রায়যীর প্রতি এই বার্তা প্রেরণ করে যে, সে যেন তার সঙ্গী-সাথিদের সাহায্য করে। সে বলে, আমাদের মধ্য হতে কেউ এই শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করতে প্রস্তুত নয়। সে (এরূপ করতে) অস্বীকার করল। আব্দুল্ল াহ্ বিন উবাই বনু কুরায়যার বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেল। সে মহানবী (সা.) ও বনু নযীরের মাঝে উত্তেজনা ও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল। সে অনবরত হুয়ীর কাছে বার্তা প্রেরণ করতে থাকে। হুয়ী বলে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি এই বার্তা প্রেরণ করছি যে, আমরা আমাদের ঘর থেকে বের হব না। আমরা আমাদের সহায়-সম্পদ পরিত্যাগ করে যাবো না। সে যা ইচ্ছা করতে পারে। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের কথায় হুয়ী প্রতারিত হয়। সালাম বিন মিশকাম হুয়ীকে বলে, হে হুয়ী! তোমার আত্মা তোমাকে প্রতারিত করেছে। যদি আমার এই আশঙ্কা না হতো যে, তোমাকে নির্বোধ মনে করা হবে- তবে আমি আমার অনুগত ইহুদীদেরকে তোমার কাছে রেখে যেতাম। হে হুয়ী! এমনটি কোরো না।

তাকে বলল, খোদার কসম! তুমি জানো, আর তোমার সাথে আমরাও জানি যে, তিনি আল্লাহ্ তা'লার সত্য রসূল। তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে আমরা অবগত। যদি আমরা তাঁর আনুগত্য না করি তবে এর একমাত্র কারণ হলো, আমরা তাঁর প্রতি হিংসাত্মক মনোভাব রাখি, কেননা নবুয়্যত বনু হারূন থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। চলো, আমরা তাঁর প্রস্তাবিত নিরাপত্তা গ্রহণ করি।

আমরা তাদের শহর থেকে চলে যাই। তুমিও জানো, তুমি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ আর (এ ব্যাপারে) আমার বিরোধিতা করেছ। আমরা যখন এখান থেকে চলে যাব, আর যখন ফল পেকে যাবে, তখন আমরা ফিরে আসব, অথবা আমাদের মধ্যে হতে কেউ একজন নিজের ফলবাগানে আসবে আর সেগুলো বিক্রি করে দেবে, অথবা সেগুলো যা ইচ্ছা করবে। অতঃপর আমাদের নিকট সে চলে আসবে। এমনটি করলে মনে হবে, আমরা যেন আমাদের শহর থেকে বেরই হই নি; কেননা আমাদের ধনসম্পদ আমাদের হাতের নাগালেই থাকবে। আমাদের জাতির কাছে আমাদের সম্মান আমাদের এই ধনসম্পদ ও কর্মকাণ্ডের কারণেই। এই সম্পদ যখন আমাদের হাতছাড়া হবে তখন আমরা অন্যান্য ইহুদীদের মতো লাঞ্ছিত হব। কিন্তু যদি মুহাম্মদ (সা.) আমাদের কাছে আগমন করেন আর তিনি যদি এক দিনের জন্যেও আমাদের দুর্গ অবরুদ্ধ রাখেন, তাহলে তিনি আর এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না, যা তিনি এখন দিয়েছেন; এবং তিনি তা করতে অস্বীকার করবেন। হুয়ী বিন আখতাব বলে, মুহাম্মদ (সা.) সুযোগ পেলে তো আমাদের দুর্গ অবরোধ করবেন। অন্যথায় তিনি ফেরত চলে যাবেন। তুমি কি দেখ নি, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইও আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে?

সালাম বিন মিশকাম বলল, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই'র কথায় কোনো বিশ্বাস নেই। সে তোমাকে ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত করতে চায়। এমন কি সে চায়, তুমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। এক্ষেত্রে সে নিজের বাড়িতে বসে থাকবে আর তোমাকে পরিত্যাগ করবে। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই, কা'বের নিকট সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু কা'ব (সাহায্য করতে) অস্বীকৃতি জানায়। কা'ব বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি জীবিত আছি ততক্ষণ পর্যন্ত বনু কুরায়যার কোনো এক ব্যক্তিও (শান্তিচুক্তির) এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই নিজ মিত্র বনু কায়নুকাকে এমনই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারাও যুদ্ধ করতে চেয়েছিল; তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং নিজেদের দুর্গে আবদ্ধ হয়ে থাকে। তারা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের সাহায্যের অপেক্ষা করতে থাকে অথচ সে নিজের বাড়িতেই বসে থাকে। মুহাম্মদ (সা.) তাদের দিকে অগ্রসর হন, আর তাদের (দুর্গ) অবরুদ্ধ করে ফেলেন। অবশেষে তারা তাঁর নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়।

ইবনে উবাই তার মিত্রদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি। কিন্তু আমরা আমাদের তরবারি নিয়ে অওসের সাথে তাদের সকল যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। এখন তো যুদ্ধের সেই যুগের সমাপ্তি হয়ে গেছে। মুহাম্মদ (সা.) আগমন করেছেন এবং তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ এখন যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। ইবনে উবাই ইহুদীও নয়, মুসলমানও নয় কিংবা সে তার স্বীয় জাতির ধর্মের ওপরও প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা তার কথা কীভাবে মেনে নিতে পারি? হুয়ী বলল, আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে শত্রুতা অব্যাহত রাখব এবং লড়াই করতে থাকব। সালাম বলল, তাহলে আমাদেরকে দেশান্তরিত করা হবে, আমাদের সম্পদ ও সম্মান নষ্ট হবে, আমাদের সন্তানরা বন্দি হবে এবং আমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে। কিন্তু হুয়ী রসূলুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত ছাড়া বাকি সব কথাকে অস্বীকার করে। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩২০-৩২১)

ইহুদী জাতির এক বয়োবৃদ্ধ সারুক বিন আবি হুকায়েক যে নির্বোধ হিসেবে পরিচিত ছিল, সে-ও বলে উঠে যে, হে হুয়ী! তুই অশুভ। তুই বনু নযীরকে ধ্বংস করে দিবি। হুয়ী ক্রোধান্বিত হয়ে বলে, বনু নযীরের সবাই আমার সপক্ষে কথা বলছে আর এই পাগল ও নির্বোধ ব্যক্তি আমাকে তিরস্কার করছে! তখন সারুককে তার ভাইয়েরা প্রহার করে এবং হুয়ীকে বলে, আমরা তোমার আদেশ মান্যকারী আর আমরা কখনোই তোমার বিরোধিতা করব না। (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৫) [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৮১)

এরপর হুয়ী নিজ ভাই জুদঈ বিন আখতাবকে দূত হিসেবে প্রেরণ করে আর বলে, যাও, মুসলমানদের নেতাকে গিয়ে বলো যে, আমরা এখান থেকে যাবো না। তোমাদের যা খুশি তা করতে পারো।

জুদঈ মদীনায় পৌঁছে হুয়ী'র বার্তা শোনায়। মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে বসে ছিলেন। তিনি (সা.) তার এ কথা শুনে উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চকিত করেন এবং মুসলমানরাও তকবির ধ্বনি উচ্চকিত করতে থাকে।

মহানবী (সা.) বলেন, 'হারাবাতিল ইয়াহুদ' অর্থাৎ ইহুদীরা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে।

মহানবী (সা.) বনু নযীরের এই কর্মকাণ্ড এবং প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণার জবাবে বনী নযীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেন আর সাহাবীরা সাথে সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করেন। ইহুদীদের এই দূত জুদঈ বিন আখতাব তাৎক্ষণিকভাবে আব্দু ল্লাহ্ বিন উবাই-এর ঘরে পৌঁছে যায় এবং রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে হওয়া কথোপকথন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে। সে নিজ ঘরে তার সাথিদের সাথে খোশ গল্পে মত্ত ছিল। সে বলে, আমি আমার মিত্রদের সংবাদ দিচ্ছি। তারা তোমাদের সাথে দুর্গে প্রবেশ করবে। সেই বার্তাবাহক দেখল যে, ইবনে উবাই-এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বর্ম পরিহিত অবস্থায় তরবারি নিয়ে ইসলামী সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণের জন্য দৌড়ে যাচ্ছেন। তখন জুদঈ সহযোগিতার আশা ছেড়ে দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে হুয়ী-এর কাছে ফিরে আসে এবং পুরো বৃত্তান্ত তাকে অবহিত করে। সে বলে, মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের বক্তব্য শুনে বলেছেন, ইহুদীরা যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে। অতঃপর তিনি তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। সে তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলো না; তাই সে বলল, এটি তাদের রণকৌশল। হুয়ী জিজ্ঞেস করে, আব্দু ল্লাহ্ বিন উবাই কী বলেছে? তখন সে ইবনে উবাইয়ের সাথে কথোপকথন সম্পর্কে বলে যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার মিত্রদের সংবাদ পাঠাচ্ছি। তারা তোমাদের সাথে দুর্গে প্রবেশ করবে। জুদঈ বলে, আমি তো তার পক্ষ থেকে সাহায্যের কোনো আশা দেখছি না।

এদিকে মহানবী (সা.) দুর্গ অবরোধের জন্য সাহাবীদেরকে প্রস্তুতিগ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। [দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৮১-১৮২]

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) এ সম্পর্কে লিখেছেন, মহানবী (সা.) অওস গোত্রের এক নেতা মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে ডেকে বললেন, তুমি বনু নযীরের কাছে যাও এবং তাদের সাথে (এ বিষয়ে) কথা বলো আর তাদেরকে বলো, যেহেতু তারা নিজেদের দুষ্কৃতিতে সীমাতিক্রম করেছে এবং তাদের প্রতারণা চরম সীমায় পৌঁছেছে , এখন তাদের মদীনায় থাকা উচিত হবে না। উত্তম এটিই হবে, তারা যেন মদীনা ছেড়ে চলে যায় আর অন্য কোথাও গিয়ে বসবাস শুরু করে। তিনি তাদেরকে ১০ দিন অবকাশ দেন । মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) যখন তার কাছে যান তখন তারা তার সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে এবং বলে, মুহাম্মদ (সা.)-কে বলে দাও, আমরা মদীনা থেকে নির্বাসিত হবো না। তোমাদের যা ইচ্ছা তা করতে পারো। মহানবী (সা.) যখন তাদের এই উত্তর শোনেন তখন অবলীলায় বলে উঠেন, আল্লাহু আকবর! ইহুদীরা তো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। অতঃপর তিনি (সা.) মুসলমানদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন এবং সাহাবীদের একটি দল নিয়ে বনু নযীর-এর বিরুদ্ধে মাঠে নামেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫২৩-৫২৪)

রাষ্ট্রের এসব বিদ্রোহীদের দমনের জন্য, যারা রাষ্ট্রপ্র ধানকে হত্যা করার মতো ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেছিল; কারণ সেসময় মহানবী (সা.) ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান; উপরন্তু তারা অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তখন সশস্ত্র যুদ্ধের ঘোষণা প্রদান করেছিলেন- তাই মদীনাকে একটি বিরাট রক্তপাত

থেকে বাঁচাতে এবং মদীনার সুরক্ষার্থে এসব বিদ্রোহীদের দ্বার রুদ্ধ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। যাহোক, সকল মুসলমান যখন একত্রিত হয় তখন মহানবী (সা.) তাদের সাথে বেরিয়ে পড়েন। এসময় মহানবী (সা.) মদীনায় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)-কে তাঁবু দিয়ে বলা হয়, তা যেন বনু নযীর-এর দুর্গের সামনে স্থাপন করা হয়। এটি এক বিশেষ কাঠের তৈরি ছিল, অনেকে এটিকে চামড়ার তৈরি বলেছেন। যুদ্ধপতাকা ধারণ করেন হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.)। মহানবী (সা.) মুসলমান বাহিনীর সাথে সামনে অগ্রসর হন, এমনকি সন্ধ্যা নাগাদ তিনি (সা.) বনু নযীর-এর বসতি পর্যন্ত পৌঁছে অবস্থান নেন এবং সেখানে খোলামাঠে আসরের নামায আদায় করেন। অন্যদিকে ইহুদীরা নিজেদের প্রাসাদসমূহে দুর্গবন্দি হয়ে গিয়েছিল এবং দুর্গের ওপর থেকে তির এবং পাথর নিক্ষেপ ক রতে থাকে। এশার নামাযের সময় হলে তিনি (সা.) নামায পড়ান এবং নামাযের পর দশজন সাহাবীকে নিয়ে নিজের বাড়ি মদীনায় ফেরত আসেন। সেসময় তিনি (সা.) বর্ম-পরিহিত এবং ঘোড়ায় আরোহিত অবস্থায় ছিলেন। তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন এবং আরেকটি বর্ণনামতে, হযরত আবু বকর (রা.)-কে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন। যাহোক, মুসলমানরা সারারাত এভাবে অর্থাৎ ইহুদীদের ঘেরাও করা অবস্থায় কাটান এবং বার বার তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করতে থাকেন। এমতাবস্থায় ভোরের লালিমা দেখার উপক্রম হলে হযরত বেলাল (রা.) ফজরের আযান দেন। সেসময় মহানবী (সা.) সেই দশজন সাহাবীকে নিয়ে সেনাবাহিনীর মাঝে ফেরত আসেন যারা তাঁর সাথে ছিলেন এবং তিনি (সা.) ফজরের নামায পড়ান। ইহুদীদের মাঝে এক ব্যক্তির নাম ছিল আযওয়াক। কোথাও কোথাও তার নাম গুযুল বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যক্তি অত্যন্ত দক্ষ তিরন্দাজ ছিল এবং তার নিক্ষিপ্ত তির অনেক দূর পর্যন্ত যেত। সে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর তাঁবু বরাবর তির নিক্ষেপ করে। সেই তির তাঁবুতে এসে লাগে। মহানবী (সা.) সেখান থেকে তাঁবু সরিয়ে তিরন্দাজদের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

(সীরাত হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৯) (কিতাবুল মাগাযি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৪)

পুনরায় রাত নেমে আসে। আব্দু ল্লাহ্ বিন উবাইও বনু নযীরের কাছে আসল না এবং তার কোনো মিত্রও এলো না, বরং সে তার বাড়িতেই বসে রইল। বনু নযীর তার কাছ থেকে সাহায্য পাবার বিষয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। সালাম বিন মিশকাম এবং কিনানা বিন সূ রিয়া দুজন হুয়ীকে বলল, ইবনে উবাইয়ের সাহায্য কোথায় গেল, যা তুমি আশা করছিলে? হুয়ী বলে, আমি এখন কী করতে পারি? এ তো রীতিমতো ধ্বংস, যা আমাদের অদৃষ্টে লেখা হয়েছে। এরইমধ্যে এক রাতে প্রায় এশার সময় হযরত আলী (রা.)-কে সৈন্যদের মধ্য থেকে অনুপস্থিত দেখা যায়। লোকেরা মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আলীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মহানবী (সা.) বলেন, তার বিষয়ে চিন্তা কোরো না, কেননা সে তোমাদেরই একটি কাজে গিয়েছে। সবে অল্প সময় গড়িয়েছে, এরই মধ্যে হযরত আলী (রা.) সেই ব্যক্তির (কাটা) মস্ত ক কেটে নিয়ে হাজির হন যার নাম ছিল আযওয়াক এবং যার তির মহানবী (সা.)-এর তাঁবু পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। হযরত আলী (রা.) তখন থেকেই তার জন্য ওঁৎ পেতে ছিলেন যখন সে মুসলমানদের প্রবীণ কোনো নেতাকে হত্যার করার চেষ্টা করছিল; তার সাথে একটি দলও ছিল। হযরত আলী (রা.) তার ওপর আক্রমণ করেন এবং তাকে হত্যা করেন। তার সাথে অন্যান্য যারা ছিল তারা পলায়ন করে। অতঃপর মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-র সাথে দশজন সদস্যের একটি দল প্রেরণ করেন যাদের মাঝে হযরত আবু দুজানা (রা.) এবং হযরত সাহল বিন হুনাইফ (রা.)-ও ছিলেন। হযরত আলী এবং তার সাথিরা আযওয়াকের সঙ্গীসাথির দলকে ধরে ফেলে, যারা হযরত আলী (রা.)-কে দেখে পালিয়ে গিয়েছিল। সাহাবীদের সেই দল তাদের সবাইকে হত্যা করে। কতক আলেম লিখেছেন, সেই দলে দশজন সদস্য ছিল। সাহাবীরা তাদের হত্যা করে তাদের মস্তক নিয়ে ফেরত আসেন, যেগুলোকে পরবতীতে বিভিন্ন কূপে নিক্ষেপ করা হয়। (সীরাত হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৯)

একটি বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা.) তাদের মস্ত কগুলোকে বনু খাতমার বিভিন্ন কূ পে নিক্ষেপ করার আদেশ প্রদান করেছিলেন।

(কিতাবুল মাগাযি, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৫)

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত বর্ণনা আগামীতে করব, ইনশাআল্লাহ্।

****

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

(২পাতার পর....)

প্রশ্নের জবাব কেবল ইসলামই দিয়ে থাকে, এবং এটাও হচ্ছে এ ধর্মের এক বৈশিষ্ট্যসূচক দিক। ইসলাম মনে করে যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্যের দু'টি মূল কারণ রয়েছে।

প্রথম কারণ, সেই সব পরিবর্তনশীল অবস্থা,যার জন্য পরিবর্তনশীল নির্দেশ ও আইনের দরকার হয়েছিল, এবং সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞ খোদা বিভিন্ন যুগ, অঞ্চল ও জাতির প্রয়োজন মোতাবেক হেদায়েত দান করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধর্মের সারমর্ম সময়ের উত্থান-পতনের আওতায় ম্লান ও অকর্ষিত হয়ে পড়ায় সেগুলো তাদের মূল অবস্থায় সংরক্ষিত হতে পারে নি।

কতিপয় ক্ষেত্রে অনুসারীরা পরিবর্তিত অবস্থার সাথে জুতসই নতুন আইন নিজেরাই প্রবর্তন করে সেগুলো আদিরূপে নাযেলকৃত কিতাবসমূহে অন্যায়ভাবে সন্নিবেশ করে নেয়। স্বগীয় বার্তার সাথে সুস্পষ্টভাবে এ ধরণের ভেজাল মেশানোয় মূল উৎস থেকে এক তাজা হেদায়াতের প্রয়োজন পড়ে। যেভাবে পবিত্র কুরআনে খোদা বলেন: 'তারা শব্দগুলোকে তাদের আসল জায়গা থেকে বিকৃত করে ফেলে এবং উহার এক বড় অংশ তারা ভুলে যায়,যার দ্বারা তাদেরকে নসিহত করা হত।' (৫:১৩)

আমরা যদি কুরআন কর্তৃক বিবৃত রীতির আলোকে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেকার পার্থক্য সমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করি,তাহলে দেখি যে, পার্থক্যগুলোর উৎসের কাছাকাছি পৌঁছলেই সেগুলো আপনাআপনিই দূর হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা খৃষ্টধর্ম ও ইসলামের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে আমাদের আলোচনাকে কেবলই যীশুর জীবন ও বাইবেলের ৪টি গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি, তাহলে বাইবেল ও কুরআনের মৌলিক শিক্ষার মধ্যে লঘুতর পার্থক্যই দৃষ্টিগোচর হবে।

কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় আমরা যদি আরো নীচে পরিভ্রমণ করি, তাহলে এসব পার্থক্যের ফাটল এতো অধিকতর হবে যে, তার উপর সেতুবন্ধ তৈরী করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং এসবের কারণ হিসেবে মূল-নাযেলকৃত বিষয়াদির পরিবর্তের জন্য মানুষের ক্রমাগত প্রচেষ্টাই দায়ী।

অন্যান্য ধর্মের ইতিহাসও একই মৌলিক বাস্তবতা প্রকাশ করে, এবং কুরআনী দর্শনেও আমরা যেটাকে শক্তভাবে সমর্থন করতে দেখি তা হচ্ছে, মানব প্রকৃতির গতির পরিবর্তন এবং স্বর্গীয় ওহীর সংশোধনের সাথে সবসময়ই এক খোদার উপাসনা থেকে বহু খোদার উপাসনা, বাস্তবাতা থেকে অলীক কাহিনী, মানবতা থেকে দেবতুল্য করার বিষয়টি জড়িত থেকেছে।

পবিত্র কুরআন আমাদেরকে বলে যে, পরবর্তীতে অঙ্গাচ্ছেদ করা সত্ত্বেও একটি সত্য-ধর্মকে পৃথক করা সবচেয়ে নিশ্চিত পন্থা হচ্ছে এর উৎপত্তিটা পর্যালোচনা করা। উৎপত্তিটা যদি খোদার একত্বের শিক্ষাকে প্রকাশ করে, কেবলমাত্র এক খোদার উপাসনা ও মানবের জন্য এক সত্য ও খাঁটি সহানুভূতির কথা বলে, তবে পরবর্তিতে সংঘটিত পরিবর্তন সত্বেও এমন ধর্ম সত্য হিসেবে গৃহীত হতে বাধ্য।

যে সব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এই নীতিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তারা ছিলেন আসলে সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তিত্ব, এবং খোদা কর্তৃক প্রেরিত সত্য রসুল, যাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা আমাদের উচিত নয় এবং যাদের সত্যতার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। স্থান ও কালের বিষয়টিকে পাশকেটে তাদের মধ্যে কতিপয় সামঞ্জস্যপূর্ণ মৌলিক বৈশিষ্ট বিদ্যমন রয়েছে, যা পবিত্র কুরআন এভাবে বর্ণনা করে-

"এবং তাদেরকে আল্লাহ্ প্রতি একনিষ্ঠভাবে বাধ্য থেকে, ন্যায়পরায়ণ হয়ে তাঁর সেবা করা এবং নামায আদায় করা ও যাকাত দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি। এবং সেটাই হচ্ছে সঠিক পথের লোকদের ধর্ম।' (৯৮:৬)

একটি চিরন্তন ধর্ম

ইসলামের আরেকটি বৈশিষ্ট-পূর্ণ দিক হচ্ছে যে, এটা শুধু এক সর্বজনীন-চরিত্রে ধর্ম হওয়ার দাবীই করে না, বরং চিরন্তন ধর্ম হওয়ারও দাবী পেশ করে, এবং তারপর এই দাবীর পূর্বশর্তগুলো পূরণের দিকেও অগ্রসর হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি বার্তা কেবল তখনই সর্বজনীন হতে পারে, যদি এটা সব দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ও খাঁটি হয়,এবং এর আধেয়-বিবৃতি সম্পর্কেও নিশ্চিত হয়। অন্য কথায়,এর নাজেলকৃত গ্রন্থগুলোর ঐশী-নিশ্চয়তাও থাকা দরকার, যাতে সেগুলো মানবীয় সংশোধন ও অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকে।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে এতে সর্ব=শক্তিমান আল্লাহ্‌র দাবী হচ্ছে, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করলাম। আর আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম।' (৫:৪)

কুরআনের সুরক্ষা

ইতিপূর্বে আমি যেভাবে বলেছি, একটি শিক্ষাকে চিরন্তরন হতে হলে কেবলমাত্র ইহার পরিপূর্ণ ও খাঁটি হওয়াই যথেষ্ট নয়, উপরন্তু ইহার মূল গঠনের

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর স্পেন সফর, ২০১৩ (মার্চ, এপ্রিল))

(পূর্বের সংখ্যার পর....)

হুযুর আনোয়ার বলেন, দুই বছর পূর্বে আমি সাবেক পোপকে এই মর্মে চিঠি লিখেছিলাম যে, আপনি নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে চেষ্টা করুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। শান্তি প্রসারের কাজে আমরা হাতে হাত রেখে কাজ করব। যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা না করা হয় আর পরাশক্তিগুলিকে যুদ্ধ থেকে বিরত না রাখা যায় তবে পৃথিবীতে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার চিঠিটি জামাত আহমদীয়া কাবাবীর এর ন্যাশনাল সদর সাহেব এক সাক্ষাতের সময় পোপের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

এখন নতুন পোপকে আমি সাধুবাদ জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করেছি এবং পুনরায় একই বার্তা তাঁকে দিয়েছি। অর্থাৎ আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে সচেষ্ট হই।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা সব সময় সম্মিলিতভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে প্রস্তুত এবং প্রত্যেকের সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রস্তুত। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে যে কেউ ডাকুক না কেন, যে কেউ চেষ্টা করবে, মানবজাতির সেবার জন্য যে-ই আহ্বান করবে আমার এর জন্য প্রস্তুত।

মসজিদ বায়তুর রহমান এর প্রতিবেশি টাউন ওলাকাও এর মেয়র আন্টেনিও রোপেরো বলেন, মসজিদের জন্য এই জায়গাটির নির্বাচন করার জন্য আমি খলীফাতুল মসীহকে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের কমিউনিটি ভালবাসার বাণীর প্রসার করছে। এখন আমরা ইসলামকে আরও ভালভাবে জানতে পারব। মেয়র সাহেব হুযুর আনোয়ারকে মসজিদ নির্মাণ হওয়ার জন্য সাধুবাদ জানান।

মসজিদ বায়তুর রহমান যে এলাকায় অবস্থিত সেই পোবলা ডে ভাল্লোবনা এর মহিলা মেয়র নিবেদন করেন, আমরা এখানে জামাতের সঙ্গে একবছর ধরে অবস্থান করছি। শুরুর দিকে আমাদের মনে আতঙ্ক ছিল আর বিরোধিতাও ছিল। এরপর আহমদীদের উন্নত আচরণ প্রকাশ পেতে শুরু করল, তারা নিজেদের মসজিদের পরিকল্পনা দেখাল, এইভাবে আমাদের সমস্ত ভয়ভীতি দূর হয়ে গেল। এখন এই মফসসলের সকলেই খুব ভাল। কোন সমস্যা নেই। আমরা প্রতিবেশীরা একে অপরকে পছন্দ করি আর মিলে মিশে থাকি।

একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি আশা করি ভবিষ্যতেও কোন সমস্যা হবে না। আমি মেয়র সাহেবকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যে, তিনি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি পাইয়ে দিতে অনেক সাহায্য করেছেন আর এই কাজে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি এখানকার কাউন্সিল এবং প্রতিবেশীদেরও ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদেরকে এখানে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেছে।

আমরা সকলে একত্রে কাজ করতে চাই আর আমরা সমাজে সমন্বিত হয়ে গেছি। আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা পুলিশদের জন্য সাহায্যকারী প্রমাণিত হব। পুলিশ কর্মকর্তারাও এসেছিলেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা পুলিশদের জন্য অনুরূপভাবে সাহায্যকারী প্রমাণিত হতে পারি। যেমন- এলাকার মানুষ যদি পুলিশকে সাহায্য করে, মানুষজন ভাল হয়, তাদের পক্ষ থেকে কোন সমস্যা না হয়, অপরাধ না হয় তবে পুলিশের কাজও সহজ হয়ে যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুলিশের সাহায্য করা যেতে পারে।

ভ্যালেনসিয়া প্রদেশের পার্লামেন্টের সদর ডি জুয়ান কোটিনো বলেন, আমি আজকের অনুষ্ঠানে অনেক আনন্দসহকারে আসতে চাইছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল সেই সব মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাত করার যারা শান্তির বিষয়ে কাজ করছে। আমি খলীফাতুল মসীহ আল খামিসকে এখানে ভ্যালেনসিয়ায় স্বাগত জানাই এবং এই প্রদেশের এই স্থানটিকে মসজিদ নির্মাণের জন্য নির্বাচিত করার জন্য সাধুবাদ জানাই।

পার্লামেন্টের সদর সাহেব বলেন, তিনি গোঁড়া ক্যাথলিক।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি সেই ব্যক্তিকে পছন্দ করি যে নিজের ধর্মের প্রতি অটল বিশ্বাস রাখে। ধর্মই মানুষকে খোদা তা'লার দিকে নিয়ে যায় এবং খোদার সঙ্গে মিলিত করে। এবং মানবতার সেবার তৌফিক দান করে। খোদা তা'লার প্রতি ঈমানের কারণে, ধর্মের কারণে আপনি মানবতার সেবা করে থাকেন।

আমরা এই বার্তাই দিতে চাই যে, বিভিন্ন ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও আমরা একত্রে মিলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে চাই, যাতে মানুষের মনের এই সন্দেহ দূর হয় যে, দুটি ধর্ম সহাবস্থান করতে পারে না,দুটি ধর্মের মানুষ একসঙ্গে কাজ করতে পারে না।

পার্লামেন্টের সদর সাহেব একথা শুনে বলেন, আমরা এজন্যই এখানে এসেছি যাতে এক সঙ্গে কাজ করতে পারি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা এখানে আসায় আমি খুশি হয়েছি। আমাদের মসজিদ সকলের জন্য উন্মুক্ত।

ভ্যালেনসিয়ায় স্পেন সরকারের প্রতিনিধি লুইস সান্তামারিয়া বলেন, খলীফাতুল মসীহকে ভ্যালেনসিয়া প্রদেশের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। এখানে যে আলোচনা হয়েছে তা নিয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত। সমস্ত ধর্মের উচিত সম্মিলিতভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। আর শান্তি, নিরাপত্তা, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব অর্জন করাই হল সমস্ত ধর্মের সাধারণ উদ্দেশ্য।

প্রতিবেশী বৃদ্ধ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন, যাঁকে এলাকার সকলে তাঁর সততার কারণে 'জজ অফ পীস নামে' চেনেন। তিনি হুযুরকে স্বাগত জানান।

মসজিদ থেকে ছয় কিমি দূরে অবস্থিত লিরিয়া নাম মফস্‌সল এর মেয়র ম্যানুয়েল ইজকুয়েরডো সাহেবও এসেছিলেন। তিনি বলেন, তাঁর টাউনের জনসংখ্যা ২৪ হাজার, যাদের মধ্যে ৭ হাজার মুসলমান, যারা দুটো সেন্টার তৈরী করেছে। এই সব লোকগুলো মরোক্কোর মত শহর থেকে এসেছে। প্রথমত এরা সমাজে সমন্বিত হয় না। এছাড়া তাদের সমস্যা হল তারা নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের প্রাপ্য অধিকার দেয় না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সমাজে মিলেমিশে থাকা উচিত এবং সমন্বিত হওয়া আবশ্যক। আমরা সমাজে সমন্বিত হওয়ার চেষ্টা করি। দ্বিতীয়ত সিজের স্ত্রী ও সন্তানকে প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। এমন জিনিস আপনি অন্য কারোর মধ্যে দেখবেন না। মুসলমানদের উচিত আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষা মেনে নারী ও শিশুদের অধিকার প্রদান করা।

কান্টাব্রিয়া-এর জাতীয় পার্লামেন্টের সদস্যের ভাষণ

সর্বপ্রথম আমি জামাত আহমদীয়া এবং বিশেষ করে জামাত আহমদীয়ার বিশ্ব নেতা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেবকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই, যিনি খোদার ঘর মসজিদ উদ্বোধনের এর এই শুভক্ষণে আমাকে আমন্ত্রিত করেছেন। ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে ভাষণের পর পুনরায় খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে সাক্ষাত করে আমি আনন্দিত। এই সাক্ষাতের ফলে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ শিক্ষা আরও এগিয়ে যাবে এবং আমরা আগের চাইতে আরও বেশি করে একে অপরের সম্পর্কে জানতে পারব। আমরা সকলে সমান, আমরা মুসলমান ও খৃষ্টান ঠিক সেই একই খোদা তা'লার উপর ঈমান আনি যা হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং হযরত ইয়াকুব এবং হযরত ইসহাক (আ.)-এর খোদা। আমাদের এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। যেমনটি নতুন পোপ মহাশয়ও বলেছেন, আমরা ধর্মীয় ভাই আর আমাদের শান্তির পথে সম্মিলিত চেষ্টা করতে হবে। ধর্মীয় নেতাদেরকে শান্তি ও ভালবাসার প্রসারের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। রাজনীতিকদেরও উচিত এই উন্নত দৃষ্টান্ত দৃষ্টিপটে রাখা।

স্পেন সরকারের প্রতিনিধি সিভির গভর্ণর এর ভাষণ

এরপর ভ্যালেনসিয়ায় স্পেন সরকারের প্রতিনিধি সিভিল গভর্ণর লুইস সান্তা মারিয়া নিজের বক্তব্যে বলেন:

আমি এই মসজিদ উদ্বোধনের জন্য খলীফাতুল মসীহকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

আমরা খৃষ্টানরা সম্প্রতি ইস্টার পালন করেছি, যার দোয়ায় শান্তি, করুনা ও অনুগ্রহের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায় আর এটিই আমাদের ধর্মের ভিত্তি। পোপ সাহেবও বলেছেন যে, অভাবপীড়িতদের সাহায্য করা উচিত। একই ধরণের কথা খলীফাতুল মসীহও গত জুমআয় বলেছেন, যখন তিনি ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা বর্ণনা করছিলেন। আর এই চিন্তাধারাই ভবিষ্যতে আন্তঃধর্মীয় সমন্বয়, শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়কের ভূমিকা পালন করবে।

স্পেন এবং ভ্যালেনসিয়া সর্বত্র খৃষ্টান, ইহুদি ও মুসলমান সহবস্থান করছে। আমাদের আইন ব্যবস্থা পুরুষ ও নারীর সম্মানের উপর গুরুত্বারোপ করে আর এটা আমাদের উচ্চ মূল্যবোধের পরিচায়ক। যে সব মানুষের এমন চিন্তাধারা ও সংকল্প, তাদেরকে আমরা স্বাগত জানাই। কেননা এটা সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সফলতা দান করুন।

এরপর ভ্যালেনসিয়ার প্রাদেশিক পার্লমেন্টের সদর ডক্টর জুয়ান কটিনো সাহেব বক্তব্য প্রদান করেন।

এরপর ১১ পাতায়.....

শিক্ষার প্রসারে নারীদের অন্তর্ভুক্তি

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)

নারীদের সম্পর্কে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত যা তাদের করা আবশ্যক, তা হলো তাদেরকে এই যুগে এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে, ধর্মের ক্ষেত্রে তারাও সেভাবেই শরিয়তের আইন কানুনের অধীনস্ত এবং সেভাবেই শরিয়তের নিয়মাবলী পালন করবেন, যেভাবে পুরুষরা করে থাকেন। এই যুগে আমরা যে কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছি, তা হলো নারীদের মস্তিষ্কে এই বিষয়টি গ্রথিত হয়ে গেছে যে তারা ধর্মীয় বিষয়াবলীতে অংগ্রহণের অযোগ্য। অনেক নারী এমন রয়েছেন, যারা মনে করেন, ধর্মীয়-বিষয়াবলীতে অংশ নেওয়া তাদের স্বামীদের কাজ।

এ কারণেই বর্তমান যুগে নারীদের ধর্ম কোন নির্দিষ্ট ধর্মে রূপান্তরিত হয়নি। শতকরা ৯৫ জন বরং এর চেয়েও বেশি এমন নারী পাওয়া যাবে, যারা কোন ধর্মকে সত্য জেনে গ্রহন করেনি বরং তারা তাদের স্বামীর কারণে ধর্মকে গ্রহণ করেছে। স্বামী যদি আজ শিয়া মতাবলম্বী হন তবে স্ত্রীও শিয়া মতবাদের অনুসারী। স্বামী যদি সুন্নী হন তবে স্ত্রীও সুন্নী। আগামীকাল স্বামী যদি শিয়া থেকে সুন্নী হয়ে যান তবে স্ত্রীও সুন্নী হয়ে যান। যেভাবে তার স্বামীর ধর্ম পরিবর্তিত হতে থাকে, অনুরূপভাবে তার নিজের ধর্মও পরিবর্তীত হতে থাকে। এই অজ্ঞতা এবং খামখেয়ালীপনার কারণেই নারীদের মাঝে ধর্মের কোন বালাই নাই।

ভেবে দেখুন, যদি বাঘের কোন ছবি থাকে, মানুষ তাতে ভীত হয় না। কেননা তারা জানে, সেই ছবি তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। অনুরূপভাবে আগুন তখনই খাবারকে সেদ্ধ করবে, যখন সত্যিকারের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে। যদি আগুনের ছবি থাকে, তবে তা কিছুই করতে পরবে না। অতএব নারীদের ধর্ম নকল, অনুকরণ-সর্বস্ব মাত্র। আর নকল আগুন যেভাবে কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না অনুরূপভাবে নকল ধর্মও কোন উপকার সাধন করতে পারে না।

ধর্মকে খাঁটি অন্তকরণে গ্রহণ করা উচিতহ্যাঁ, সত্যিকার আগুন যেভাবে খাবার পাকাতে পারে, সেভাবে সত্যিকার ধর্মও উপকারী সাব্যস্ত হতে পারে। আমাদের স্বামীরা এমন বলেন, শুধুএ উদ্দেশ্যে যদি কেউ ধর্মকে গ্রহণ করেন, তবে এতে কোন কল্যাণ নেই।

আমাদের দেশে একে রেকাবী বা বেগুনী ধর্ম বলা হয়। কোন রাজা তার দরবারে বেগুনের খুবই প্রশংসা করেন। তার এক চাটুকার সভাসদও বেগুনের প্রশংসা শুরু করে বলে, তার, অর্থাৎ বেগুনের শরীর এমন যেন কোন সুফি আচকান অর্থাৎ জুব্বা পরিধান করে আছে। তার সবুজ কান্ড দেখে মনে হয়, যেন সবুজ পাগড়ী পরিধান করে আছে। সবুজ পাতার মাঝে এমন দেখা যায়, যেন কোন

আবেদ বান্দা ইবাদত করছে। কিন্তু কিছুদিন পর বেগুনের কারণে রাজা সমস্যা অনুভব করলে তিনি দরবারে বলেন, বেগুন একটি বাজে জিনিস। এটি শুনে সেই সভাসদ, যে কিনা পূর্বে প্রশংসা করেছিল, বলতে লাগল, হুযূর বেগুন কোন সবজি হলো। একে সবজির মধ্যে গন্য করাও তো বোকামি, এটি বড় বাজে এবং ক্ষতিকর জিনিস। কেউ একজন জিজ্ঞাসা করল, কিছুদিন পূর্বেই তো তুমি এর বড়ই প্রশংসা করছিলে আর এখন গালিগালাজ করছ, ব্যাপার কি?

সে উত্তর দিল, আমি রাজার চাকর বেগুনের চাকর নই। তিনি যখন গুণকীর্তন করেছেন, আমিও করেছি। আর তিনি যখন দোষারোপ শুরু করেন, আমও গালিগালাজ শুরু করি।

সতুরাং অনুরূপ ভাবে নারীদের ধর্ম বেগুনী ধর্ম হয়ে থাকে। এ কারণেই এমন অনেক নারী দেখা যায়, যারা তাদের স্বামীদের ধর্মকে এমনি ভাবে মেনে থাকে। ইল্লা মাশাআল্লাহ্।

নারীদের জন্য ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ধর্মের উপকার নিষ্ঠা এবং প্রকৃত-মর্ম জানার মাধ্যমে লাভ হয়। এটি কুরআন করীমের শিক্ষা। কিছুলোক বলে থাকে মহিলাদেরকে পুরুষের মনস্তুষ্টি এবং আরাম আয়েশের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম এটি বলে না। বরং ইসলাম এটি বলে যে, নারীদের ওপর শরিয়ত সেভাবেই প্রযোজ্য, যেভাবে পুরুষদের ওপর। যেভাবে পুরুষদের জন্য শরিয়তের আদেশাবলী পালন করা আবশ্যক, অনুরূপভাবে নারীদের জন্যও আবশ্যক। ভেড়া, ছাগল যেমন মানুষের আরাম আয়েশের জন্য এবং এগুলোর সৃষ্টির নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য নাই, অনুরূপ ভাবে নারীরাও, ব্যাপারটি এমন নয়। সুতরাং কুরআন করীম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই। পুণ্যবতী মহিলা যে তার আদেশাবলী মান্য করবে, তার জন্য জান্নাতের অঙ্গীকার করা হয়েছে।আর যে এর অবাধ্যতা করবে, তার জন্য জাহান্নামের শাস্তি অবধারিত। তাই সর্বপ্রথম নারীদের চিন্তা-চেতনায় এই বিষয়টি প্রবিষ্ট করানো প্রয়োজন যে, নারীদের জন্য ধর্ম সেভাবেই প্রয়োজন, যেভাবে পুরুষদের জন্য। যেন তারা ইসলাম কি-তা বুঝতে পারে। কেননা, কারো কোন জিনিসের প্রয়োজন অনুভব হলে সে সেই বস্তুটি অর্জনের পদ্ধতি শিখে। আবার যখন সে তার মর্ম অনুধাবন করে, তখন তা অর্জনের চেষ্টা প্রচেষ্টা চালায়। সুতরাং ধর্মের জ্ঞান অর্জন করার অধিকার নারী পুরুষ উভয়ের রয়েছে। কেননা ধর্মের আদেশাবলী লঙ্ঘন করা যেভাবে পুরুষদের জন্য ক্ষতির কারণ, অনুরূপভাবে নারীদের জন্যও ক্ষতির কারণ। অত:পর আর কি কারণ রইতে পারে যার কারণে নারীরা পুরুষদের ন্যায় ধর্মীয় জ্ঞানে বুৎপত্তি লাভ করবে না?ভেবে দেখুন, যদি কেউ ধর্মের উপকার কি তা বুঝে, তবে সে খোদাকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর আহকামের অনুসরণ করবে। কিন্তু যদি তার এ বিষয়ে জ্ঞানই না থাকে, তবে খোদাকে মানার তার প্রয়োজনীয়তাই বা কি? এর চেয়ে বরং না মানাই ভালো। অনুরূপভাবে যতক্ষন পর্যন্ত সে নবী রাসূলকে মান্য বা অমান্য করার লাভ বা ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হবে না, সে কেন বিশ্বাস আনয়ন করবে?সুতরাং এ সম্পর্কিত বিষয়ের উপকার এবং প্রকৃত-মর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। আর পুরুষরা যেভাবে ধর্মের জ্ঞান অর্জন করে, অনুরূপভাবে নারীদেরও তা অর্জন করা উচিত।

কুরআনে মুত্তাকী নারীদের কথা: কুরআন করীমে দুইজন মুত্তাকী (খোদাভীরু) নারীর কথা উল্লেখ আছে। যাদের মাঝে একজন ফেরাউনের স্ত্রী। ফেরাউন সেই সৌভাগ্য লাভ করেনি, কিন্তু তার স্ত্রী তাক্ওয়ার পথে চলেছিলেন। তিনি ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করেছিলেন। তাই মূসার ওপর ঈমান এনেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে তার কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। আর এর চেয়ে বড় ফজিলত আর কি হতে পারে, সেই কিতাবে যা চিরস্থায়ী বিস্তার তার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এর কারণ হলো, তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন ধর্মের ব্যাপারে অবশ্য-পালনীয় যে সমস্ত বিষয়াদী পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য, তা নারীদের জন্যও প্রযোজ্য। অপর উদাহরণ মরিয়ম (আ.) এর। তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা ছিলেন। সেই সময় গোমরাহী চরমে পোঁছেছিল।তিনি এমন পরহেযগারী দেখালেন যে, তার ছেলে নবুওয়াত লাভ করল।

দুনিয়ার ওপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অনেক বড় অনুগ্রহ আছে, কিন্তু হযরত মরিয়ম এরও অনেক বড় আগ্রহ আছে। কেননা, তার তরবিয়তেই এমন মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, যিনি কিনা দুনিয়ার ওপর অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন।

কুরআন করীম ঘোষণা করে, তিনি ভীষণ মুত্তাকি এবং পরহেযগার নারী ছিলেন। তার সন্তান তার কাছ থেকে তাক্ওয়ার শিক্ষা লাভ করে। তাই লক্ষ্য করে দেখুন, কুরআন করীমের যেখানে হযরত মসীহ্ (আ.) এর উল্লেখ রয়েছে, সাথে সাথে হযরত মরিয়ম এরও উল্লেখ রয়েছে।

ইসলামের জন্য নারীদের আত্মত্যাগ:আবার আমরা দেখি, আঁহযরত (সা.) এর যুগে যখন অন্ধকারের ঘনঘটা চরম আকার ধারন করে, তখন নারীরা ধর্মের অনেক বড় খেদমত করেছিল। কেননা, তারা বুঝতে পেরেছিল, পুরুষরা যেভাবে ধর্মের সেবা করতে পারে, আমরাও তেমনিভাবে ধর্মের সেবা করতে সক্ষম। হয়তবা একথা অনেকেরই জানা নেই, আঁহযরত (সা.) এর ওপর যিনি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন তিনি একজন নারী ছিলেন। হযরত রাসূল করীম (সা.) হেরা গুহায় ইবাদত করতেন। সেখানে তাঁর ওপর জিবরাঈল নাযিল হন আর তাঁকে (সা.) খোদা তা'লার কালাম পড়ে শুনান। তাঁর (সা.) যেহেতুএ বিষয়ে কোন কিছুই জানা ছিল না, তাই তিনি (সা.) বুঝতে পারেন নি। তিনি (সা.) বোধ করলেন হয়তবা আত্মার প্রবঞ্চনা, এর ফলে যেন কোন ভুল সিদ্ধান্ত না হয়ে যায়। তিনি (সা.) ভীত হলেন। খাদিজা (রা.) কে বললেন আমি অসুস্থতা অনুভব করছি। তিনি (সা.) তার এই অবস্থার নাম অসুস্থতা রাখলেন। কিন্তু খাদিজা (রা.) বুদ্ধিমতী ছিলেন। যদিও সেই যুগে ওহী নাযিল হতো না, কিন্তু তিনি (রা.) বুঝতে পারলেন এটি ওহী ছিল।

আজকাল তো সকলেই জানে, আল্লাহ্র তরফ থেকে কালাম এসে থাকে। তারপরও দাবীকারককে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে বলে, পাগল হয়ে গেছে। খাদিজা (রা.) এমন জাতির সদস্যা, যারা খোদাতে বিশ্বাসী ছিল না, এমনকি কোন ইলহামী কিতাব তাদের কাছে ছিল না, ইলহামের পক্ষে তার কোন অবস্থান না থাকা সত্বেও তিনি (রা.) বলেন, আপনার ওপর ওহী ইলাহী অবতীর্ণ হয়েছে, এটি কখনই অসুস্থতা হতে পারে না। "কাল্লা ওয়াল্লাহে লা ইউখযি কাল্লাহু আবাদান" খাদিজা (রা.) বলেন, এটি আপনার অসুস্থতা নয়! এটি নিশ্চিত ভাবে কালামে ইলাহী। আপনি লোকদের সাথে উত্তম আচরণ করে থাকেন।

আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখেন, বিপদের সময় তাদের সাহায্য করেন। সুতরাং খোদা আপনাকে কখনই পরাজিত হতে দিবেন না বা অপদস্থ হতে দিবেন না।

(বুখারী কিতাব বাদাওয়াল ওহী) ইনি একজন নারী ছিলেন, যিনি এমনি ভাবে ঈমান এনেছিলেন যার দৃষ্টান্ত পুরুষদের মাঝেও পাওয়া যায় না। পুনরায় আমরা যদি তাঁর আমলের দিকে দৃষ্টি দিই, তবে দেখি যে তিনি কোন সাধারণ ঈমান আনয়ন করেন নি।

তিনি এমন ঈমান এনেছিলেন যে, যখন শত্রুরা আঁহযরত (সা.) এর ওপর আক্রমণ করা শুরু করে, তখন তিনি (রা.) তার সমস্ত সম্পত্তি রাসূল করীম (সা.)কে অর্পণ করে বলেন, ধর্মের রাস্তায় খরচ করুন। হয়তবা কেউ ধারণা করতে পারে, তিনি তো আঁহযরত (সা.) এর স্ত্রী ছিলেন, তাই তিনি যা কিছু করেছেন আপন স্বামীর সম্মান রক্ষার্থে করেনছন। কিন্তু না, ইসলামের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র নারী ছিলেন না বরং এমন আরও অনেকে ছিলেন, যারা নিষ্ঠা এবং ভালোবাসার এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিলেন যার নযির পাওয়া ভার।নিষ্ঠাবান এক নারী :ওহোদ যুদ্ধের একটি ঘটনা রয়েছে যে, কাফেররা তিন হাজার লস্কর নিয়ে আসে। অপরপক্ষে এক হাজার আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত রাসূল করীম (সা.) এর সাথী। যুদ্ধের সময় মুসলমানদের একটি দল এমন একটি ভুল করে বসে, যার ফলে মুসলমান সৈন্য-বাহিনীর পদ টলায়মান হয়ে যায়। বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। রাসূল করীম (সা.) একা পড়ে রইলেন। কাফেররা তাঁর (সা.) ওপর এতো পাথর বর্ষণ করে যে, তিনি আহত হয়ে ভূপাতিত হন আর লাশের নীচে চাপা পড়েন। এর ফলে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। এই সংবাদ যখন মদীনায় পৌঁছায়, যা ওহোদ থেকে চার মাইল দূরে অবাস্থিত, তখন সকল নারী পুরুষ বিচলিত হয়ে বাইরে বের হয়ে প্রকৃত বিষয় জানার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে যায়। এদিকে লাশের নীচ থেকে রাসূল করীম (সা.)কে বের করা হলো। জানা গেল তিনি (সা.) জীবিত আছেন। এটি শুনে সব মুসলমান সৈন্য একত্রিত হয় আর কাফেররা পলায়ন করে।

মুসলমানরা মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়। যখন তাদেরকে মদীনবাসীরা দেখতে পায়, এক নারী সম্মুখে অগ্রসর হয়। সে রাসূল করীম (সা.) এর আত্মীয় ছিল না। সে মদীনার অধিবাসী ছিল। মক্কাবাসীরা মদীনাবাসীদের থেকে আলাদা ছিল। সে কেবল ধর্মের খাতিরে রাসূল করীম (সা.) এর প্রতি ভালবাসার সম্পর্ক রাখত। সেই নারী এক সাহাবীকে, যিনি আগে আগে আসছিলেন, জিজ্ঞাসা করে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর অবস্থা কি? যেহেতুতিনি (সা.) জীবিত ছিলেন আর পিছনে আসছিলেন, তাই এই প্রশ্নকে সাধারণ প্রশ্ন ভেবে উত্তর না দিয়ে তিনি বলেন, তোমার পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন। এতে সেই নারী বলে, আমি আমার বাবা সম্পর্কে জানতে চাই নি। আমি জানতে চেয়েছি রাসূলুলুল্লাহ্ (সা.) এর অবস্থা কি?

কিন্তু তিনি উত্তর দেন নি, বললেন, তোমার স্বামীও মৃত্যুবরণ করেছন। একথা শুনে সেই নারী বলল, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর অবস্থা জানতে চাচ্ছি, তাঁর (সা.) কি অবস্থা? এরও উত্তর না দিয়ে বললেন, তোমার ভাইও মৃত্যুবরণ করেছে। এতে সে বলল, তুমি আমার প্রশ্নের কোন জবাব দিচ্ছ না, আমি তো জানতে চাচ্ছি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর অবস্থা কি? সেই সাহাবী বললেন, ভালো, তিনি আসছেন। এটি শুনে সে বলল, আলহামদুলিল্লাহ্, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যদি জীবিত থাকেন তবে আমার আর কারও কোন পরওয়া নাই। (সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড পৃ: ৮৪ প্রকাশ লাহোর ১৯৭৫)

এই ঘটনা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রতি সেই নারীর ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার আন্দাজ করুন। যা কেবল ধর্মের খাতিরেই ছিল, আর ভেবে দেখুন কেমন নিষ্ঠাবতী ছিলেন। কিন্তু বর্তমান যামানায় দেখুন, কারো যদি কোন ছোট শিশু মারা যায় তার অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়। কিন্তু সেই নারীর পিতা মৃত্যুবরণ করে, স্বামী শহীদ হলো, ভাইকে হত্যা করা হয়, ছেলে কেউ নেই। অথচ এরাই নিকটাত্মীয় হয়ে থাকে। যাদের কোন দুঃখকষ্ট আঘাত হানলে নারী তো দূরের কথা পুরুষের হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু এই নারীর হৃদয়ে এতো শক্তি, দৃঢ়তা ছিল যে, তাকে পিতা স্বামী এবং ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ শুনানো হয় অথচ সে আঁহযরত (সা.) সুস্থতার সংবাদ শুনে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে আর কোন কষ্টের ধার ধারে নি।

এই ধরনের আরো অনেক ঘটনা আছে, আমি এটি আঁহযরত (সা.) এর সময়ের ঘটনা শুনালাম। একটি তাঁর মৃত্যুর পরের ঘটনা শুনাই।আরও একটি দৃষ্টান্ত :হিন্দা নামী এক নারী ছিল। সে আঁহযরত (সা.) এর প্রাথমিক যুগে এমন শত্রুতা রাখত যে যখন তাঁর (সা.) চাচা হযরত হামযা (রা.) শহীদ হন, সে তাঁর (সা.) কলিজা বের করে দাঁত দিয়ে চিবায়, যেন আঁ হযরত (সা.) কষ্ট পান। কিন্তু সে যখন রাসূল করীম (সা.) এর ওপর ঈমান আনে, তখন সে ধর্মের সেবায় মশগুল থাকতো। এমনকি কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। হযরত ওমর (রা.) এর সময় মুসলমানদের সাথে খ্রিষ্টানদের এক বৃহৎ লস্করের মোকাবেলা হয়। পরিস্থিতি এমন ছিল, একজন মুসলমানের বিপরীতে চৌদ্দজন খ্রিষ্টান লড়াই করছিল। এমতাবস্থায় মুসলমানদের পা টলায়মান হয়ে যায়। সেই সময় হিন্দা তার অপর নারী সঙ্গীনীদের নিয়ে বলেন, তারা পুরুষ হয়ে শত্রুর মোকাবেলা থেকে পিছু হটছে। আস, আমরা নারী হয়ে তাদের উচিত শিক্ষা দিই। এটি বলেই তারা তাঁবুর খুঁটি উপে নিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে যায় আর মুসলমানদের ঘোড়াগুলোকে মার দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়ে দেয়। তখন হিন্দা তার স্বামীকে বলে, তোমার লজ্জা করে না! কাফের অবস্থায় তো ইসলামের বিরুদ্ধে আটঘাট বেঁধে মোকাবেলা করতে আর এখন পিঠ ফিরিয়ে পালাচ্ছ?

(ফতুহু শশাম আরবী খ-১ পৃ: ১৩৭)

সুতরাং নারীরা এমনও বীরত্বের কাজ করেছে।

নারীদের গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরামর্শ প্রদান : রাসূল করীম (সা.) এর রীতি ছিল আর হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত, তিনি বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজ বিবিগণের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। যখন তিনি (সা.) হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হন, কাফেররা মক্কাতে যেতে বাধা দেয়। তখন তিনি (সা.) মুসলমানদেরকে ইহরাম খুলে ফেলতে বললেন। কিন্তু তারা খুলল না। তখন তিনি (সা.) স্ত্রীর কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলেন। তিনি (স্ত্রী) বললেন, আপনি যান আর কুরবানী করে ইহরাম খুলে ফেলুন, এটি দেখে সবাই এমনি করবে। তিনি (সা.) এমনি করলেন, সকল মুসলমান ইহরাম খুলে ফেলল

(বুখারী কিতবুস শুরুত। বাব ফিল জিহাদে ওয়াল মালাহাতে মাওআ আহলিল হারবে ওয়া কিতাবাতিশ শুরুতে)

সুতরাং সর্বদাই নারীরা বড় বড় খেদমত করেছে আর মহৎ বিষয়াবলীতে পরামর্শ দিয়েছে। অতএব বর্তমান কালের নারীদের এটি ভুল ধারণা যে, আমরা কিছুই করতে পারি না। অথচ তারা অনেক কিছুকরতে পারে। আর যেভাবে পুরুষদের জন্য অন্যকে ধর্ম শিখানো অত্যাবশ্যকীয়, অনুরুপ ভাবে নারীদের জন্যও অত্যাবশ্যকীয়।

নারীদের মহৎ কর্মসমূহ : মাসলা মাসায়েলে ভুল করলে রাসূল করীম (সা.) এর স্ত্রীগণ পুরুষদের ধমক দিতেন। হযরত আয়েশা (রা.) কুরআন শরীফের দরস দিতেন আর পুরুষরাও এতে শামিল হয়ে শুনত। আবার এমনও অনেক নারী গত হয়েছেন, যারা মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে পুরুষদের পাঠদান করতেন, কিন্তু বর্তমানে সমস্যা হলে নারীরা স্বয়ং অশিক্ষিত আর তাদের ধারণা হলো আমরা কী বা করতে পারি, কিছুই পারি না। অথচ এ ধারণা একেবারেই ভুল। পূর্ববর্তীদের মাঝে যারা অশিক্ষিতও ছিল তাদের মাঝেও এই মনোভাব পরিলক্ষিত হয়নি।বর্তমান যুগের এক নারীর উদাহরণ :এখনও দৃষ্টিগোচর হয় যে, নারীরা ধর্মের সাথে প্রেম ভালবাসার সম্পর্ক রাখেন। তাদের মাঝে বড় নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়, তারা বড় নিষ্ঠাবতী হন।

এমনি এক ঘটনা আমার স্মরণ আছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সময় এক নারী আসে। সে তাঁর (আ.) সামনে অনেক কান্নাকাটি করে বলল, আমার ছেলে খ্রিষ্টান হয়ে গেছে, আপনি দোয়া করুন, সে যেন একবার কলেমা পাঠ করে তারপর মারা যাক বা তার যা ইচ্ছা তাই হোক (তাতে কোন আপত্তি নাই -অনুবাদক)। ছেলে খ্রিষ্টানদের কাছে লেখাপড়া শিখেছিল। ভীষণ জ্বর থাকা সত্ত্বেও সে পালিয়ে যায়। তার মাও তার পিছু নিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে বুঝালেন কিছুদিন পর সে বুঝতে পেরে মুসলমান হয়ে যায়। মুসলমান হওয়ার দুই থেকে তিন দিন পর তার জীবনাবসান হয়। কিন্তু এতে তার মা কোন প্রকার শোক প্রকাশ করে নি।

সুতরাং আজও এমন নারী বিদ্যমান আছে, যদিও খুব বিরল, যারা ঈমানের বিপরীতে কোন কিছুর পরওয়াই করে না। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় স্বামী যদি খ্রিষ্টান হয়ে যায় তবে স্ত্রীও খ্রিষ্টান হয়ে যায়। যেই ধর্ম তার স্বামীর, তারও সেই ধর্মই হয়ে থাকে। কিন্তু এমনও নারীরা আছে, যারা জীবন দিতে পছন্দ

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

করবে কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করা সহ্য করবে না। কিন্তু সেই নারীরা কারা? তারাই, যারা ধর্ম বুঝে শুনে গ্রহণ করে আর সেই সাথে ধর্মে পুরোপুরি বুৎপত্তি লাভ করে।

নারীদের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক : সুতরাং সবচেয়ে জরুরী বিষয়, হলো নারীরা ধর্মের বুৎপত্তি লাভ করবে, নারীরা ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হবে। ধর্মের সাথে তাদের দৃঢ় সম্পর্ক থাকবে। ধর্মের প্রতি তাদের ভালোবাসা থাকবে। ধর্মের প্রতি তাদের গভীর টান থাকবে। তাদের ভিতর যখন এই বিষয়গুলো সৃষ্টি হবে তখন তারা আপনা আপনি এর ওপর আমল করবে। আর অন্যান্য নারীর জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দেখাবে এবং তাদের মাঝে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে পরিণত হবে। হ্যাঁ তাদের এটিও বুঝা উচিত, পুরুষরা যেভাবে পুরুষদেরকে ধর্ম শিখায়, একই ভাবে নারীরা নারীদের ধর্ম শিখাতে পারে আর ধর্মের সেবা করতে পারে। নারীরা যে ধর্মের সেবা করতে পারে এর প্রমাণস্বরূপ আমি পেশ করেছি, আর সেগুলো দ্বারা এটিই বুঝা যায় যে, নারীরা সর্বদা ধর্মের সেবা করেছে। যেহেতুএটি প্রমাণ হয়েছে যে কিছুনারী এমন করেছেন, তাই বুঝা যাচ্ছে আরও অনেকেই করতে সক্ষম।

পূর্ববর্তী যামানার নারীদের সম্পর্কে এটি বলা যে, তারা অত্যন্ত খোদাভীরু আর পারহেযগার ছিলেন, আমরা তাদের মত কিরূপে কাজ করতে পারি? নিতান্তই ভগ্নোৎসাহ এবং ভীরুতার লক্ষণ। অনেক নারী আছেন, তারা বলেন, আমরা কি হযরত আয়েশা (রা.) হতে পারব যে, চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাব? তাদের ভাবা উচিত, আয়েশা (রা.) কিভাবে আয়েশা হলেন; তিনি চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন, সাহস দেখিয়েছেন, তবেই না আয়েশা হয়েছেন। এখনো তাঁর মত হতে হলে সাহস এবং চেষ্টাপ্রচেষ্টার প্রয়োজন। কিছুকরার পূর্বে মনোবল খুইয়ে বসা তেমনি যেমন, একটি বাচ্চাকে নসিহত করা হয় পড়ালেখা করলে তুমিও অমুক ব্যক্তির ন্যায় এম,এ ডিগ্রী লাভ করবে। কিন্তু সে বলে আমি কেমনে তার মত এম, এ হতে পরবো? তাই সে পড়ালেখাই ছেড়ে দিয়েছে।

সেই ব্যক্তি চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছিল বলেই তো এম, এ হয়েছিল। অতএব সে যদি চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায় তবে সে যে এম,এ হবে না, এতে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

সাহাবাগণ (রা.) কিভাবে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন :

সহাবীগণ রাসূল করীম (সা.) সাহাবীর মর্যাদা কিভাবে লাভ করতে পেরেছিলেন আর কিভাবে তারা বড় বড় পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন? চেষ্টা প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তারা লাভ করেছিলেন। তা না হলে তারা তো ছিল সেই লোক, যারা রাসূল করীম (সা.) এর প্রাণের দুশমন ছিল। তাঁকে (সা.) গালিগালাজ করত। হযরত ওমর (রা.), যিনি রাসূল করীম (সা.) এরপর দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন, শুরুতে আঁহযরত (সা.) এর এত ভীষণ শত্রু ছিলেন যে, তিনি তাঁকে (সা.) হত্যার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়। সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছ? তিনি (রা.) বলেন, মুহাম্মদ (সা.)কে হত্যা করতে যাচ্ছি। সেই ব্যক্তি বলল, "আগে তোমার ভগ্নি ও ভগ্নিপতিকে তো হত্যা কর, যারা কিনা মুসলমান হয়ে গেছে? তারপর মুহাম্মদ (সা.)কে হত্যা করিও।" এটি শুনে তিনি (রা.) ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। বোনের বাড়ির দিকে যাত্রা শুরু করলেন এবং (বাড়ি) পৌঁছে দরজা বন্ধ পেলেন। (ভিতরে) এক ব্যক্তি কুরআন পাঠ করছিলেন আর তাঁর (রা.) বোন এবং ভগ্নীপতি তা শুনছিলেন। তখন পর্যন্ত পর্দার আদেশ নাযিল হয় নি। হযরত উমর (রা.) দরজার কড়া নেড়ে বললেন, খোল। তাঁর (রা.) শব্দ শুনে ভিতরের লোকেরা এই ভয়ে ভীত হলো যে, তিনি (রা.) তাদের হত্যা করবেন। তাই তারা দরজা খুলল না। হযরত ওমর (রা.) বললেন, দরজা যদি না খোল তবে আমি ভেঙ্গে ফেলব। তারপর তারা কুরআন করীমের পাঠকারী মুসলমান কে লুকিয়ে রাখলেন, সাথে ভগ্নিপতিও লুকিয়ে রইলেন। বোন একা সামনে অগ্রসর হয়ে দরজা খোলে। হযরত উমর (রা.) বিজ্ঞাসা করেন, বল কি করছিলি আর কে কি পড়ছিল? তার বোন ভয় পেয়ে কথার মোর ঘুরাতে চাইল। হযরত ওমর (রা.) বললেন, যা পড়া হচ্ছিল আমাকে তা শুনা। তার বোন বলল, আপনি তার অপমান করবেন। তাই আমাদের প্রাণে মেরে ফেললেও তা শুনাব না। তিনি (রা.) বললেন, না আমি ওয়াদা করছি তার অপমান করব না। অতঃপর তারা তাকে কুরআন শরীফ পাঠ করে শুনাল। তা শুনা মাত্রই হযরত ওমর (রা.) কাঁদতে লাগলেন এবং দৌড়িয়ে রাসূল করীম (সা.) এর কাছে পৌঁছালেন। তলোয়ার তার হাতেই ছিল। রাসূল করীম (সা.) তাকে দেখে বললেন, ওমর! এ বিষয় আর কতকাল গড়াবে। এ কথা শুনেই তিনি (আ.) অঝর নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বের হয়েছিলাম আপনাকে হত্যা করতে, কিন্তু আমি নিজেই শিকারে পরিণত হলাম।

(তারীখুল খামিস, লেখক- শেখ হুসাইন বিন মুহাম্মদ বিনুল হাসানুদ দিয়ার বকরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯৫ প্রকাশ বৈরুত)

সুতরাং প্রথম প্রথম তাদের অবস্থা এমনই ছিল, যা থেকে তারা ধীরে ধীরে উন্নতি করে। আবার এই সাহাবীরাই পূর্বে মদ পান করত। পরস্পর লড়াই ঝগড়া করত। এগুলো ছাড়াও বহু ধরনের দুর্বলতা তাদের মাঝে ছিল। কিন্তু তারা যখন আঁহযরত (সা.) এর আনুগত্য স্বীকার করলেন আর ধর্মের জন্য দৃঢ়-মনোবল এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাজ করলেন, তখন কেবলমাত্র তারা নিজেরাই উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন নি, বরং অন্যদেরও সুউচ্চ মকামে অধিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে পরিণত হন। তারা জন্মগতভাবে সাহাবী ছিলেন না বরং তারা অন্য সর্বসাধারণের মতই ছিলেন।

কিন্তু তারা আমল করেছেন, হিম্মত দেখিয়েছেন, তবেই না তারা সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেছেন। আজও যদি আমরা অনুরূপ কাজ করি, আমরাও সাহাবীর মর্যাদা লাভকারী হতে পারব।

এটি শয়তানের ফাঁদ। যখন দেখে যে, কোন মানুষ ধর্মের রাস্তায় চলার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা চালানোর ইচ্ছা পোষণ করছে, তখন সে তার সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এই ভাবের উদয় ঘটায় যে, তুমি কিইবা করতে পারবে। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ মাকড়সার জালকে উপস্থাপন করা যায়। যখন মাছি বলপ্রয়োগ করে জাল ছিড়ে ফেলে তখন মাকড়সা তাকে আরও বেশি আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। শয়তান ও অনুরূপভাবে বান্দার আশে পাশে ঘুরঘুর করে। সে যখন দেখে, আমার বাঁধন আলগা হয়ে যাচ্ছে তখন সে আরও শক্ত করে বাঁধে। সেই বাঁধনগুলোর মাঝে এটিও একটি বাঁধন যে, যখন কোন নারী বা পুরুষ পুণ্য-কর্ম করতে চায়, তখন সে এই খেয়াল সৃষ্টি করায় যে, আমরা কি অমুকের মত হতে পারব? এমন তো হতেই পারে না, তাই চেষ্টা করাই বৃথা। অথচ অমুক ব্যক্তি চেষ্টা প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সেরূপ হতে পেরেছিলেন। সুতরাং সেও যদি চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায়, তবে কেনই বা সে তার মত হতে পারবে না!

নবীদের স্ত্রী হওয়া ফযিলত লাভের কারণ নয় : পারি? তারা যদি নবীর স্ত্রী হওয়ার কারণে ধর্মের সেবা করে থাকেন, তবে কি হযরত নূহ (আ.) এর স্ত্রী কি নবীর স্ত্রী ছিলেন না, হযরত লুত (আ.) এর স্ত্রী কি নবীর স্ত্রী ছিলেন না? কিন্তু তারা কী করেছে? নবীকে অস্বীকার করে ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে। কেবল নবীর স্ত্রী হওয়াই যদি কোন কল্যাণের কারণ হতো, তবে কেন তারা পুণ্যবতী হলেন না, কেন খোদার সাথে দৃঢ়-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন না, আর কেনই বা তারা ধর্মের সেবা করে দেখালেন না? প্রকৃত বিষয় হলো, তারা খোদার আহকামের ওপর আমল করেনি, তাই তারা ধ্বংস হয়েছে। আর আমাদের রাসূল করীম (সা.) এর বিবিগণ আমল করেছেন, তাই তারা উঁচুমকাম লাভ করেছেন। ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহ্দীয়ান্নাহুম সুবুলানা

(সূরা আনকাবুত : ৭০)

অর্থাৎ যে আমাদের নিকটে পৌঁছার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করে, আমরা তার জন্য দরজা খুলে দিই। সুতরাং সেই সকল পুরুষ ও মহিলা, যারা আঁহযরত (সা.) এর যুগে চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছেন, ধর্মের খাতিরে গৃহহীন হয়েছেন, প্রাণ ও সম্পদ খোদার রাস্তায় ব্যয় করেছেন, নিজ কামনা বাসনা, আত্মীয়-স্বজন, মাতৃভূমি, এক কথায় সকল প্রকার ভালোবাসা ও প্রিয় বস্তুকে কুরবান করেছেন, তারাই ধর্মের জগতেও অতি উচ্চ পদমর্যাদা লাভ করেছেন, আর দুনিয়াতেও বড় বড় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। আজও যদি পুরুষ ও মহিলারা অনুরূপ চেষ্টা প্রচেষ্টা চালান, নিজে ধর্ম শিখেন আর এর ওপর আমল করে দেখান, অপরকে বুঝান এবং আমল করানোর চেষ্টা করেন, ধর্মের বিপরীতে যদি কোন কিছুর পরওয়া না করেন, তবে তারাও অনুরূপ হতে পারবেন। এখন আমি কিছুমৌলিক বিষয় বর্ণনা করব, যেগুলো স্মরণ রাখা একান্ত প্রয়োজন।

খোদাকে অদ্বিতীয় জ্ঞান করা :

ইসলামের সবচেয়ে বড় আকিদা হলো, খোদা আছেন আর তিনি এক-অদ্বিতীয়। এই আকীদার বিস্তৃতির জন্য রাসূল কীম (সা.) কে কঠিন থেকে কঠিনতর কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। যেহেতুমক্কাবাসীদের আয়ের উৎস ছিল মূর্তি বানানো, আর এই আয়ের উপরেই তাদের জীবনযাপন করতে হত, তাই মূর্তিকে পরিত্যাগ করা তাদের নিকট বড় কঠিন কাজ ছিল। আঁহযরত (সা.) যখন মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলে তাদেরকে বুঝাতে চাইলেন, তখন এটি ধারণা করা উচিত নয় হযরত আয়েশা (রা.), তারা তো নবীর স্ত্রী ছিলেন, তাই তারা ধর্মের সেবা করেছেন। আমরা কি করতে তারাএক সভার আহ্বান করে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করল, যেন সে আঁহযরত (সা.)কে এ সমস্ত কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রাখে। অত:পর সেই ব্যক্তি রাসূল করীম (সা.) এর নিকট এসে বলল, আপনি যদি ধন-ভান্ডার চান, তবে আমরা আপনাকে সম্পদের পাহাড় গড়ে দিব। আপনি যদি শাসন-ক্ষমতা চান, তবে আমরা

(এরপর শেষের পাতায়.....)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্ব নেতা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব! এই মসজিদটি ভীষণ সুন্দর, যেটি তৈরী করতে আপনারা অনেক পরিশ্রম করেছেন। আমি এখানে উপস্থিতবিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদেরকে সালাম জানাচ্ছি। কেননা আমরা এখানে রহীম ও রহমান খোদার নামে একত্রিত হয়েছি, যিনি খৃষ্টানদের জন্য পিতা খোদা,পুত্র খোদা এবং রুহুল কুদুস। কিন্তু তিনি একই সত্তা। তাই যেহেতু খোদা তা'লা আমাদের সকলকে একত্রিত করেছেন তাই এটি এক শুভক্ষণ। আর এই সমাজে প্রত্যেকের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা জরুরী, তা সে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হোক বা নাস্তিক হোক। আর আমার মতে আমরা এখানে এমনই এক পরিবেশ তৈরী করার চেষ্টা করছি। এই অর্থে আমরা সকলে আল্লাহ্‌র সন্তান ও পরিবার।আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য ধন্যবাদ। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্ব নেতা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব আমাদের মাঝে স্বয়ং এখানে এসেছেন, এরজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। আর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল অতিথিবৃন্দকেও ধন্যবাদ জানাই।

এরপর হুযুর আনোয়ার ডাইসে এসে ভাষণ দান করেন।

তাশাহুদ ও তাউয পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন। সকল অতিথিবৃন্দকে আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এরপর বলেন,

মসজিদের উদ্বোধনের বিষয়ে কিছু বলার পূর্বে আমি সকল অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যাদের অধিকাংশ অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। আপনাদের আগমণ আমাদের জন্য আনন্দের কারণ।

ইউরোপ ও পশ্চিমা বিশ্বে মুসলমান ও ইসলাম ধর্মকে ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখা হয়। আর এই ধর্মের অনুসারীদেরকে উন্নাসিক ও উগ্রবাদী মনে করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। এমন ধারণাও রয়েছে যে, একজন মুসলমান অমুসলিমদেরকে অপছন্দ করে এবং তাদেরকে নিজেদের সঙ্গে কথা বলার যোগ্য বলে মনে করে না। ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে এমন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও,বিশেষ করে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদেরই মসজিদের মধ্যে মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এখানে আপনাদের উপস্থিতি বলে দিচ্ছে যে আপনারা কতটা উদার মনের। যদিও মানুষ বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তবুও এখানে আপনাদের আগমণ প্রশংসনীয় কাজ।

আপনারা যদি এই অনুষ্ঠানে অনুসন্ধান করতে এসে থাকেন যে দেখি তো মুসলমানেরা কি বলে বা মুসলমানেরা সাধারণত কেমন মানুষ, তবে সেটাও সম্ভব। এখানে আপনাদের আগমণের যা-ই কারণ হোক না কেন, এই বরকতমণ্ডিত অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে আর এই উপলক্ষ্যে আপনারা যে সময় বের করতে পেরেছেন তার জন্য আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যারা আমাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমাদের ধমীয় দায়িত্ব। রসুল করীম (সা.)-এর আদেশ- যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না সে নিজ স্রষ্টার প্রতিও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। ইসলাম অনুসারে যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সামনে বিনয় প্রদর্শন না করে এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে বরং খোদার সামনেই বিনয় প্রদর্শন করে এবং খোদার প্রতিই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, তবে এমন বক্তি খোদার প্রতিও একনিষ্ঠ থাকে না। এই কথাগুলির মাধ্যমে আমি পুনরায় বলতে চাই যে, আমরা সকলে আহমদীয়া মুসলিম কমিউনিটির সদস্যরা আমাদের মসজিদে আপনাদের আগমণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এখন আমি আপনাদের সামনে মসজিদ এবং প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে কিছু ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সর্বপ্রথম আমি প্রতিবেশী, কাউন্সিলর এবং শহরের মেয়রকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে, তারা আমাদেরকে এখানে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছেন। আমি এটাও বলতে চাইব যে, এই মসজিদ আমাদের ইবাদতের স্থান হওয়ার পাশাপাশি এই এলাকার সৌন্দর্যবৃদ্ধিও ঘটিয়েছে। কেননা পথ চলতি মানুষদের দৃষ্টি এই মসজিদের উপর এসে থেমে যায়। রাস্তায় মানুষ গাড়ি চালাতে চালাতেও মানুষ এই মসজিদের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আরও একটি বিষয় আমি বলতে চাই যে, কিছু প্রতিবেশী মসজিদ নির্মাণের বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কিত ছিল। তাদের ধারণা ছিল, মসজিদ নির্মাণের ফলে এলাকার শান্তি ও সৌম্য প্রভাবিত হবে। রাস্তায় যানযট বৃদ্ধি পাবে, মানুষ যত্রতত্র আবর্জনা নিক্ষেপ করবে এবং পরিবেশ নোংরা করবে। আমি আশা করি এবং এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সমস্ত আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত হবে। আপনারা সকলে নিশ্চয় দেখেছেন যে, বিগত কয়েক সপ্তাহে এই মসজিদে অনেক কাজ হয়েছে। অনেক মানুষ এখানে একত্রিত হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অনেকে এখানে আহার করেছেন। কিন্তু আমার মতে, এগুলো তাদের জন্য নিশ্চয় কষ্টদায়ক ছিল না। অন্তত আমি এই এলাকায় কোন ধরণের নোংরা ও আবর্জনা দেখি নি। তবে হ্যাঁ, এই কয়দিনে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আবর্জনা সংগ্রহকারী ট্রাকগুলিকে কিছুটা বেশি সময় ধরে কাজ করতে হয়েছে হয়তো এর জন্যও আমি তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সত্যিকার মুসলমানকে ইসলাম স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয় যে, পরিচ্ছন্নতা তার ধর্মের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কেবল বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার আদেশই দেওয়া হয় নি, বরং অভ্যন্তরীণভাবেও পরিপূর্ণ পরিচ্ছন্নতা অর্জনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: নতুন বছরের শুরুতে যখন অধিকাংশ মানুষ নতুন বছরে সারারাত জুড়ে পার্টি করে,আমরা তখন স্থানীয় পর্যায়ে রাস্তাঘাটগুলি পরিস্কার করতে সাহায্য করি এবং প্রশাসনকে জনবল দিয়ে থাকি যাতে তারা পার্টির পরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে পারে। আমরা এটা এজন্য করি যে, আমাদের ধর্ম আমাদেরকে এমনটি করার আদেশ দিয়েছে। প্রতিবেশীদের সাহায্য করা এবং তাদের যেন কোন বিষয়ে কোনও প্রকার কষ্ট না হয় তা সুনিশ্চিত করা আমাদের কর্তব্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন: রসুল করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ক্রমাগতভাবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ করার এবং তাদেরকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। রসুল করীম (সা.) বলেছেন, আমাকে এ বিষয়ে এত বেশি জোর দেওয়া হয়েছে যে, অনেক সময় আমার মনে হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে হয়তো সম্পত্তির উত্তরাধিকার বানিয়ে দিবেন। তাই প্রতিবেশীদের বিষয়ে যত্নবান থাকার এতটা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: স্পেনিশ জাতির মানুষের আরও একটি গুণ রয়েছে যেটির আমি অনেক প্রশংসা করে থাকি। তারা পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। স্পেনিশ মহিলারা ঘরবাড়ি পরিস্কার রাখে এমনকি নিজেদের বাড়ির বাইরে রাস্তাও পরিস্কার করে। এখানে যাওয়ার সময় আমি নিজে মহিলাদেরকে বাড়ির সামনের অংশটুকু পরিস্কার করতে দেখেছি।

হুযর আনোয়ার বলে: এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই মসজিদ নির্মাণের পর এই অঞ্চলের মানুষের মনে পরিচ্ছন্নতার মান ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে হয়তো কিছুটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।কিন্তু আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমরা আপনাদেরকে অভিযোগ করার সুযোগ দিব না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রতিবেশীদের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, তাই আমি এটাও বলে দিতে চাই যে, প্রতিবেশীদের সংজ্ঞা কি? কেবল আপনার গৃহ সংলগ্ন গৃহটিই আপনার প্রতিবেশী নয়, বরং উভয় দিক থেকে একশটি গৃহ পর্যন্ত দূরত্বের বাসিন্দরা আপনার প্রতিবেশী হিসেবে বিবেচিত হবে। ট্রেন, কার বা বাসে আপনার সফর সঙ্গীরাও আপনার প্রতিবেশী। এমনকি আপনার সহকর্মীও আপনার প্রতিবেশী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিবেশীর সংজ্ঞা অনেক ব্যপক ও বিস্তৃত।আমাদেরকে শেখানো হয়েছে যে, আমরা এমন কোন কাজ করব না যার কারণে প্রতিবেশীদের কষ্ট হয়। তাই আমরা এখানে আপনাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য আসি নি, আপনার সেবার জন্য আমরা এসেছি। আমরা নিজেদের কমিউনিটিকে আপনাদের অংশ বানিয়ে নিতে এসেছি। আপনাদের কাজকর্মে সহযোগিতা করতে এবং আপনাদের সঙ্গে হেসেখেলে বসবাস করতে এসেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজ জামাত আহমদীয়া দুশটির বেশি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা যেখানেই যাই, সেখানে 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' এর বাণী প্রচার করি। আমরা সকলকে এই বাণীই পোঁছে দিই যাতে মানুষের সঙ্গে স্নেহ ও ভালবাসাও সম্পর্ক থাকে। আমাদের কোন কর্মই কাউকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। রসুল করীম (সা.) এর হাদীসে তিনি (সা.) বলেছেন, সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান যার হাত ও জিহ্বা থেকে প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় মানুষ নিরাপদ থাকে। তাই আমরা সকল আহমদী এই শিক্ষামালা অনুসারে চলার চেষ্টা করি।অর্থাৎ বর্ণ জাতি ও ধর্মের উর্ধ্বে মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে থাকা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীম আমাদের শিক্ষা দেয়, যে আমাদের কেবল খোদা তা'লার অধিকারই প্রদান করলে চলবে না, বরং মানুষের অধিকারও প্রদান করা উচিত। সমস্ত বিষয়ে আমাদের সত্যিকার ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন করতে হবে। কেননা অন্যায় করে আপনারা নিজেদেরকে খোদার আসনে বসিয়ে দেন। (ক্রমশ...)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 25 July, 2024 Issue No.30

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আপনাকে আমাদের হাকেম অর্থাৎ শাসক বানাতে প্রস্তুত আছি। আর আপনি যদি চান, আপনার কথা সর্বেসর্বা হবে, তবে আগামীতে আমরা আপনার পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ করব না। আর আপনি কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকলে আমরা আপনার চিকিৎসা করাতেও রাজি আছি। তবুও আপনি দেবদেবীর বিরুদ্ধে কথা বলা ছেড়ে দিন। রাসূল করীম (সা.) বললেন, তোমরা যদি সূর্যকে আমার ডান হাতে আর চাঁদকে আমার বাম হাতে এনে দাও, তবুও আমি একথা বলা থেকে বিরত হবো না যে, আল্লাহ্ একক এবং তাঁর কোন শরীক নাই।সুতরাং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস যাব্যতীত নাজাত বা মুক্তিলাভ অসম্ভব।

এসম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অন্যান্য গুণাহ সমূহ তো ক্ষমা করবো, কিন্তু শির্ক করলে ক্ষমা করবো না। (নিসা : ৪৯)

আজকাল এটি ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করেছে। মুসলমানদের মাঝে যদিও মূর্তিপূজা পরিলক্ষিত হয় না, তবে এর পরিবর্তে কবর পূজা করা হয়। একই ভাবে নারীরা যদি নিজ-স্বামী, প্রিয়জন, নিকটাত্মীয় সম্পর্কে বলে, তাদের ধর্ম যা আমারও ধর্ম তাই, এটাও এক অর্থে শির্ক। আবার এই মানত বা কথা পূর্ণ হলে অমুক পীরের নামে উৎসর্গ করা হবে, একথা বলাও শির্কভুক্ত। এছাড়া আরো অনেক ধরনের শির্ক আছে, যেগুলোতে বিশেষ ভাবে নারীরা আজকাল জড়িত। বস্তুত এটি ভয়ানক একটি বিষয়। সুতরাং নারীদের জন্য সবচেয়ে জরুরী আকীদা যা তাদের দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকা উচিত, তা হলো খোদাকে এক অদ্বিতীয় জ্ঞান করা এবং কোন গুণাবলীতে, কোন কর্মকান্ডে, কোন নামে খোদার সমতুল্য কাউকে দন্ডায়মান করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা।

ফেরেশ্তাদের ওপর ঈমান আনয়ন করা : দ্বিতীয় আকিদাটি হলো ফেরেশ্তাকুলের ওপর এই বিশ্বাস রাখা যে তারাও খোদা তা'লার সৃষ্টি। তারা মানুষের হৃদয়ে পুণ্য-কর্মের প্রেরণ জোগায়। তাদের ওপর ঈমান আনয়ন করার অর্থ হলো, যখনই হৃদয়ে কোন নেক কাজ করার ইচ্ছা জাগ্রত হবে, তৎক্ষণাৎ সেই নেক কাজটি সম্পাদন করা, যাতে আরো বেশি পুণ্য করার উচ্ছা জাগ্রত হওয়ার পর্যাপ্ত জায়গা খালি থাকে।

কুরআন করীমকে আল্লাহ্র কিতাব হিসেবে বিশ্বাস করা এবং সকল রাসূলের ওপর বিশ্বাস আনয়ন করা: তৃতীয় আকিদা হলো এই বিষয়ের ওপর দৃঢ়বিশ্বাস রাখা যে, কুরআন করীম আল্লাহ্ তা'লার কিতাব এবং এটি ব্যতীত আরো কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে।

চতুর্থ আকিদা হলো, সমস্ত নবী রাসূলকে সত্য বলে মানা।

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান :পঞ্চমটি হলো, মৃত্যুর পর উত্থিত করা হবে এবং হিসাব গ্রহণ করা হবে। এই আকিদা সমূহে বিশ্বাস না রাখলে কোন নারী বা পুরুষ মুসলমান হতে পারে না। তাই এগুলোর ওপর ঈমান রাখা একান্ত আবশ্যক।এ তো গেল আকিদার কথা। এখন আমি আমলের (কাজ) উল্লেখ করবো, যেগুলোকে ইসলাম অবশ্যই পালনীয় বলে আখ্যায়িত করেছে।

নামায পড়া : সর্বপ্রথম হচ্ছে নামায। যা আদায় করা একান্ত জরুরী। কিন্তু এটি আদায়ের ব্যাপারে চরম পর্যায়ের অলসতা প্রদর্শন করা হয়। বিশেষ করে মহিলাদের মাঝে এই অলসতা অধিক দৃষ্টিগোচর হয়। তারা বহু ওজর আপত্তি উত্থাপন করে। যেমন তাদের অনেকে বলে, আমি শিশু সন্তানের মা, কাপড় পাক পবিত্র রাখতে পারি না, নামায কিভাবে পড়বো?

কিন্তু কাপড় পবিত্র রাখা কি খুবই কষ্টের কাজ, যা একেবারেই সম্ভব না? এমন তো নয়। সাধানতা অবলম্বন করলে কাপড় পবিত্র রাখা সম্ভব। আর যদি সাবধানতা অবলম্বন খুবই দুরূহ হয়, তবে কি এতটুকু ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না যে, এক জোড়া কাপড় শুধুএই উদ্দেশ্যে বানানো হোক, যা কেবল নামায পড়ার সময় পরিধান করা হবে। কোন মহিলা যদি এতই গরীব হয় যে, তার পক্ষে আরেক জোড়া কাপড় বানানো সম্ভব নয়, তবে তার জন্যও নামায মাফ নয়। সে নোংরা কাপড়েই নামায আদায় করবে। প্রথমত মানব বৈশিষ্টের মধ্যেই এটি থাকা উচিত যে, মানুষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। তাই কাপড় চোপড় অপবিত্র হয়ে গেলে পরিষ্কার করা উচিত। তবে যদি এমন হয় যে পরিস্কার কারার কোন উপায়ই নেই, তবুও নামায ছাড়া যাবে না। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক মহিলাই নামায আদায করে থাকে। আর যারা আদায় করে, তারাও অদ্ভুত পন্থায় নামায আদায় করে থাকে। দাঁড়ানোর সাথে সাথেই রুকুতে চলে যায়। দাঁড়ানোর পূর্বেই বসে পড়ে। এখনো বসার ফুরসত হলো না, সেজদায় চলে যায়। এতো দ্রুততার সাথে পড়ে যে, বুঝেই উঠা যায় না কি পড়ছে। এমন নারীদের স্মরণ রাখা উচিত, তারা রং তামাশা করার জন্য দাঁড়ায়নি বরং নামায পড়ার জন্য দন্ডায়মান হয়েছে। আর নামায হলো আল্লাহ্র সামনে বিনয় এবং ভয়ভীতির সাথে দাঁড়ানো এবং খোদার সমীপে নিজের প্রয়োজন নিবারণের আবেদন করা। কারো নিকট কিছু চাইলে কি তার সামনে এমন আচরন করা হয়। না, বরং তাকে তো সম্মান ও অনেক মূল্যায়ণ করা হয়। অনুরোধ ও তোষামদ করা হয়। তারা খোদার সামনে কিছু চাইতে তো দাঁড়ায়, কিন্তু তাদের আচার আচরণে সম্মান প্রদর্শনের কোন লক্ষণই নেই, এর কারণ কি! তাদের হৃদয়ে ভয় সৃষ্টি হয় না, তারা বিনয় ও নম্রতা দেখায় না, বরং এমন ভাব দেখায়, যেন খোদা তা'লা তাদের মুখাপেক্ষী অথচ আল্লাহ্ তা'লা কারো মুখাপেক্ষী নন। আমরা সকলে তার মুখাপেক্ষী, দয়ার পাত্র।

তাই আমাদের আবশ্যিক ভাবে সম্মান দেখানো উচিত। তাঁর ভয় হৃদয়ে সঞ্চার করা উচিত। নিতান্তই বিনয় এবং নম্রতার সাথে তার সমীপে নিবেদন করা উচিত। খুব অল্প সংখ্যক পুরুষ এমনটি করে না। কিন্তু অধিকাংশ মহিলা নামাযকে একটি উটকো ঝামেলা ভাবে। তাই যত তাড়তাড়ি সম্ভব ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চায়। অথচ নামায তাদেরই মঙ্গালের খাতিরে, খোদার মঙ্গালের জন্য নয়। সুতরাং নামাযকে একান্ত নিষ্ঠার সাথে আদায় করা উচিত।

(আনোয়ারুল উলুম, চতুর্থ খন্ড, পৃ: ২৯-৪৮)

মধ্যেই এর চিরস্থায়ী সংরক্ষণের একটি নিশ্চয়তা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। পবিত্র কুরআন এই মৌলিক চাহিদাটি পর্যাপ্তভাবে পূরণ করে, এবং যে সত্তা কুরআন করীম অবতীর্ণ করেছেন, তিনি অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় এ ঘোষণা দিয়েছেন যে:'নিশ্চয় আমরাই এ উপদেশবাণী (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমরাই এর সুরক্ষাকারী।' (১৫:১০)

অন্যকথায়, খোদা নিজেই এ ধর্মের সুরক্ষা করবেন এবং এতে কখনই কোন অবৈধ হস্তক্ষেপ হতে দেবেন না। এ গ্রন্থের সংরক্ষণের একটি সনাতন পদ্ধতি তো এই যে, ঐশী অভিপ্রায় অনুসারে যুগ যুগ ধরেই লক্ষ লক্ষ এমন লোক ছিলেন,যারা কুরআনের মূলপাঠ মুখস্ত রেখেছে,এবং এর অভ্যাস আজও জারী আছে। এছাড়াও প্রেরিত বাতাটির আসল গুরুত্ব ও নির্যাস সংরক্ষণের মূল ঐশী রীতি হচ্ছে প্রত্যেক শতাব্দীতে পথপ্রদর্শক ও সংস্কারক নিযুক্ত করা, এবং পরবর্তী যুগে একজন শ্রেষ্ঠ

সংস্কারক ও পুনরুজ্জীবনকারীর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করা। আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে ইসলামের অনুসারীদের মধ্যকার মতপার্থক্য ও বিরোধ সমূহের মীমাংসার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মূলনীতি সংরক্ষণের জন্য ঐশী নির্দেশের আওতায় স্বয়ং সর্বশক্তিমান খোদা কর্তৃক তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন।

মূলত: সংরক্ষণ সম্পর্কিত কুরআনের এ দাবীটির কোন নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক সমর্থন আছে কি -না সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।এ প্রশ্নের জবাবের একটি সূত্র এ বিষয়ের মধ্যে নিহিত যে, বহু সংখ্যক অমুসলিম গবেষক রয়েছেন, যারা ইসলামের পবিত্র নবী (সা.)এর তিরোধানের পর পবিত্র কুরআনের মূলপাঠে সামান্যতম কোন হস্তক্ষেপ থাকার বিষয়টি প্রমাণ করতেও পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন।

আসলে, এমন অনেক অমুসলিম গবেষকও রয়েছেন, যারা এক্ষেত্রে তাদের ব্যপক অনুসন্ধানের পরও এ বিষয়টি অনুভব করে এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, কুরআন বাস্তবিকপক্ষে এর মূল অবস্থায় বজায় ও সংরক্ষিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্যার উইলিয়াম মূর তার রচিত গ্রন্থ 'দি লাইফ অব মুহাম্মদ'- এ বলেন,'আমরা অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এ নিশ্চয়তা দান করতে পারি যে, পবিত্র কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতই মুহাম্মদ (সা.)-এর নিজস্ব স্বাভাবিক ও অপরিবর্তিত রচনা। (পৃ: ২৮) (ক্রমশ....)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir